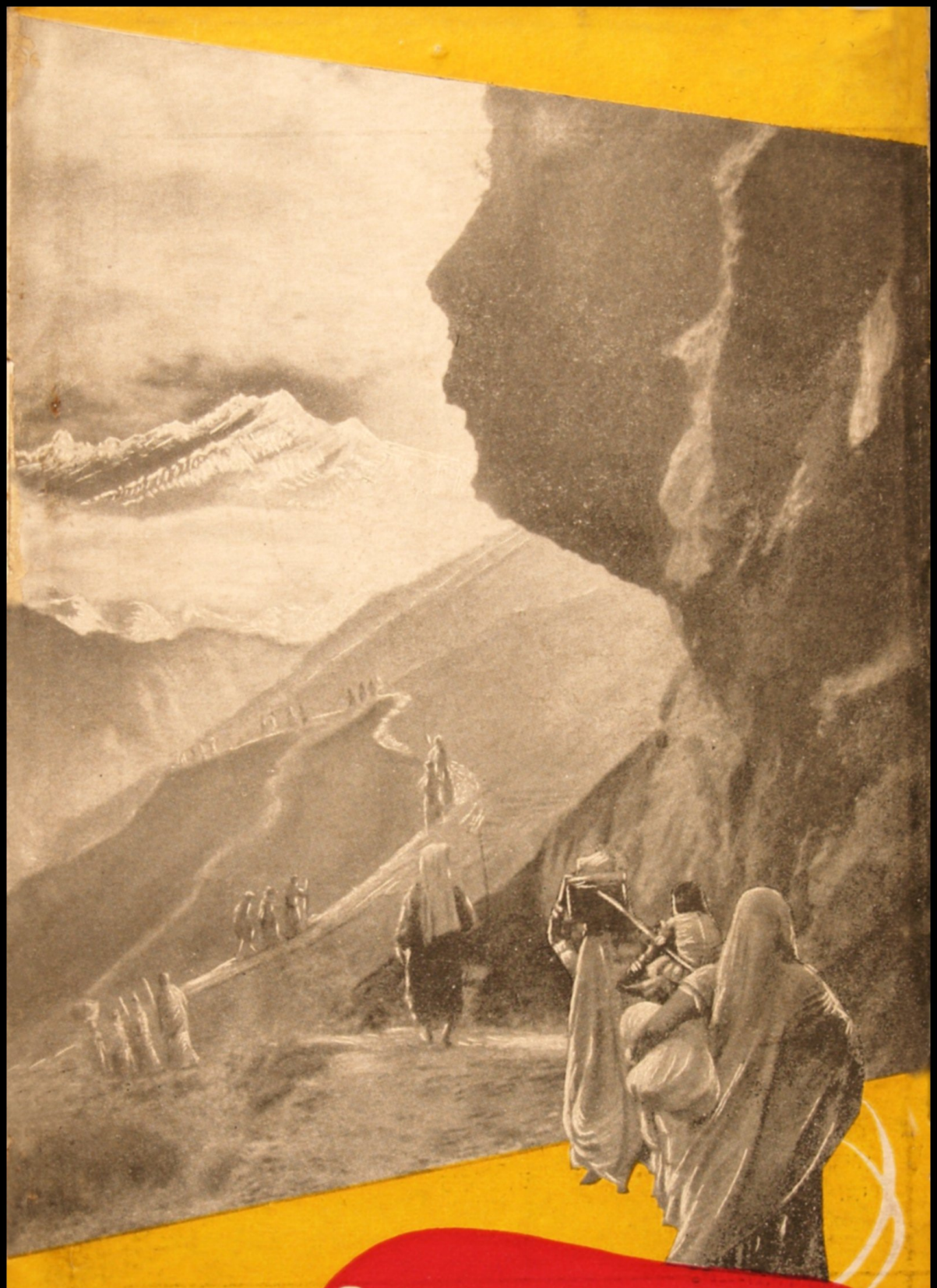

মহাপ্রস্থানের পথে

-ভ্রমণ কাহিনী-

শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল

চিত্রে উল্লেখিত স্থান পরিচিতি

দেবপ্রয়াগ : গড়বালের একটি প্রধান কেন্দ্র। বদরীনাথের পাণ্ডাদের বসতি। এখানে রামচন্দ্র মন্দির আছে। ভাগীরথী এবং অলকানন্দার সঙ্গমস্থল।

শ্রীনগর : কেন্দ্রীয় স্থান। কাছাকাছি বহু দেবালয় এবং অন্যান্য লোকালয় আছে। বাজারে বহুপ্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। কেদার বদরী যাত্রীদের জন্য ডাণ্ডী কুলীর আড্ডা।

রুদ্রপ্রয়াগ ঃ এখানে রুদ্রেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে নীচে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম দেখা যায়। মন্দিরে 'রুদ্রেশ্বর' প্রস্তর নির্ম্মিত লিঙ্গ।

গুপ্তকাশী ঃ এ-অঞ্চলের একটি প্রধান স্থান। যাত্রাসম্বন্ধীয় পুস্তক ও চিত্রাদি এখানে পাওয়া যায়। প্রধান মন্দিরের বিগ্রহ বিশ্বেশ্বর। তাহার পাশে আধুনিক পার্ব্বতী মন্দির। সম্মুখে মণিকর্ণিকা কুণ্ড।

ত্রিযুগীনারায়ণ ঃ বৃক্ষহীন গ্রাম। এখানের ত্রিযুগীনারায়ণ মন্দির বিখ্যাত। মন্দিরের উত্তরে ব্রহ্মকুণ্ড ও পশ্চিমে রুদ্র, বিষ্ণু ও সরস্বতী নামে তিনটি ছোট ছোট কুণ্ড আছে। কথিত আছে, এখানে শঙ্কর ও হৈমবতীর বিবাহ হয় এবং সেই বিবাহের হোমাগ্নি তিন যুগ ধরিয়া প্রজ্বলিত রাখা আছে।

কেদারনাথ ঃ তুষার মণ্ডিত গিরি-প্রাচীরের ক্রোড়ে কেদারনাথ। কেদারনাথের মন্দির উচ্চ মঞ্চের উপর নির্ম্মিত। গঠন ও অবস্থান দুই মহান। অবারিত দ্বার মন্দির। বিগ্রহ মহিষের পিঠের আকারের স্বাভাবিক এক প্রকাণ্ড প্রস্তর। মন্দিরের জগমোহনে কতকগুলি প্রাচীন প্রস্তর মূর্তি এবং মধ্যস্থলে পিতলের একটি বৃষ মূর্তি আছে। মন্দির বৈশাখ হইতে আশ্বিন—ছয় মাস খোলা থাকে। বাজারে নানা দ্রব্যের দোকান আছে। উচ্চতা প্রায় ১২০০০ ফুট। তিনদিকে পর্ব্বত বেষ্টিত। এখান হইতে নিকটের মন্দাকিনী ও দুধগঙ্গার গর্জ্জন শোনা যায়।

উখীমঠ ঃ কেদারের রাওল সাহেবের বাসস্থান এবং তাঁহার অধীন দেবস্থানগুলির কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়। এখানে আছে ওঁকারনাথের বিশাল মন্দির, মন্দিরে আছে মান্ধাতার, কেদারনাথের ও মধ্যমেশ্বরের মূর্তি। শীতকালে কেদার ও মধ্যমের নিজ নিজ মন্দির যখন বন্ধ থাকে, তখন এইখানে তাঁহাদের পূজা চলে। ওঁকারনাথ পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গ। উখীমঠ এ-অঞ্চলের বিশিষ্ট শহর।

শ্রীতুঙ্গনাথ ঃ মন্দাকিনী ও অলকানন্দার উপত্যকাদ্বয়ের শীর্ষদেশে প্রায় ১২০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। বসতিটি ছোট, জনবিরল এবং বৃক্ষহীন। এখান হইতে কেদার বদরী তুষারমণ্ডিত গিরিরাজি দেখা যায়। শ্রীতুঙ্গনাথের মন্দির প্রাচীন এবং বিশাল। শ্রীতুঙ্গনাথ পঞ্চকেদারের এক কেদার। শীতের ছয়মাস শ্রীতুঙ্গনাথে মন্দির বন্ধ থাকে।

চামোলি ঃ আর এক নাম লাংগঙ্গা। বিশিষ্ট শহর, গড়বাল জেলার এক সব্‌ডিভিসনের হেড্‌কোয়ার্টার্স। নীচে অলকানন্দা বহিতেছে। বাজার দোকান আছে।

গরুড়গঙ্গা ঃ এখানে গরুড়ের ছোট মন্দির আছে, তাহার নীচে গরুড়গঙ্গাতে স্নানের ঘাট।

যোশীমঠ : প্রাচীন স্থান। শ্রীবদরীর রাওল সাহেবের বাসস্থান ও দপ্তর এখানে আছে। রাওল সাহেবের মঠ-সংলগ্ন নৃসিংহ দেবী প্রভৃতি দেবতার স্থান। ইহা চারিদিকের পথের মিলন-কেন্দ্র। দক্ষিণে কুমাওনে যাতায়াতের পথ আছে। এখান হইতে ৯ মাইল পূর্বে তপোবন নামক প্রাচীন স্থান।

পাণ্ডুকেশ্বর : বিষ্ণুগঙ্গার তীরে অবস্থিত স্থায়ী বড় বসতি ও বাজার আছে। পাণ্ডুকেশ্বরের মন্দির দুইটি একটি চত্বরের মধ্যে অবস্থিত। মন্দির দুটির অবস্থা জীর্ণ। একটি মন্দিরে পঞ্চবদরীর মধ্যে গণ্য যোগবদরীর মূর্তি আছে।

বদরীনাথ ঃ শ্রীবদরীধাম বৎসরের অর্দ্ধেক সময় মাত্র খোলা থাকে। উচ্চতা ১০৪৮০ ফুট। উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। বদরী কেদার অপেক্ষা বড় শহর, যাত্রী সমাগমও বেশী। বাজারে হিমালয়জাত নানা দ্রব্যের ও খাবারের বড় বড় দোকান আছে। বদরীনাথের মন্দিরেও কেদারের মত অখণ্ড জ্যোতি জ্বলে।

নন্দপ্রয়াগ ঃ এখানে মন্দাকিনী পূর্ব দিক হইতে আসিয়া অলকানন্দার সহিত মিশিয়াছে। সঙ্গমের নিকট কয়েকটি ভাঙ্গা মন্দির আছে।

কর্ণপ্রয়াগ ঃ এখানে পিন্দর নদ পূর্ব দিক হইতে আসিয়া অলকানন্দায় মিশিয়াছে। কর্ণের মন্দির বৃহৎ, সঙ্গমের বহু উর্দ্ধে অবস্থিত। কথিত আছে, কর্ণ এখানে তপস্যা করেন।

খুঁটিনাটি

তীর্থযাত্রার সময়কাল—প্রতি বৎসর অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে শ্রীবদরীনাথের মন্দিরের দরজা খোলা হয়। সেই হিসাব করিয়া মোটামোটি একমাস আগে হ'তে যাত্রীরা হরিদ্বারে সমবেত হন।

প্রদক্ষিণ পথের নিশানা—হরিদ্বার হ'তে যাত্রারম্ভ। হৃষিকেশ হয়ে দেবপ্রয়াগ অবধি তপোলোক। দেবপ্রয়াগ হ'তে রুদ্রপ্রয়াগ অবধি দেবলোক। তারপর রুদ্রপ্রয়াগ হ'তে একদিকে শ্রীকেদারনাথ অবধি ও অন্যদিকে চামোলী হয়ে শ্রীবদরীনাথ অবধি ব্রহ্মলোক। শ্রীবদরীনাথ হ'তে কর্ণপ্রয়াগ, মেহলচৌরী হয়ে রামনগর অথবা রাণীক্ষেত হয়ে ফিরলে তবে তীর্থপ্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হয়।

যানবাহন—পদব্রজে যায় বহু নরনারী। কিন্তু আজকাল প্রায় অধিকাংশ পথ মোটরবাসে যাওয়া যায়। এ ছাড়া কাণ্ডি, ডাণ্ডি ও ছোট ঘোড়া পাওয়া যায়।

আবশ্যিক জিনিসপত্র—ইদানীং প্রায় সকল আবশ্যিক সামগ্রীই রাস্তায় পাওয়া যায়। পথে আহার্য বস্তুর অসুবিধা নাই। উপযুক্ত গরম পরিচ্ছদ প্রয়োজন। পেটের অসুখ, মাথাধরা ও শ্রমজ্বরের জন্য কিছু ঔষধপত্র সঙ্গে থাকলে ভালো হয়। জুতার ফোস্কা ও পায়ের ব্যথার মালিশ সঙ্গে থাকলে ভাল।

প্রতি দুই মাইল, তিন মাইল ও চার মাইল পার হ'লেই সাময়িক বসবাসের জন্য বিশ্রামাগার অর্থাৎ চটি পাওয়া যায়। চটিতেই আহার্য সামগ্রী মেলে। বাসনপত্রাদি চটিতেই পাওয়া যাবে। প্রত্যেক দলের সঙ্গে একজন পাণ্ডার প্রতিনিধি অর্থাৎ ছোড়েদার নিলে সকল দিকেই সুবিধা হয়।

একজন যাত্রীর পক্ষে হরিদ্বার হ'তে অন্ততঃ দু'শ টাকা সঙ্গে থাকলে ভালো হয়। কুলী সঙ্গে নিলে আর এক-শ টাকা দরকার।

যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য দ্রব্যাদি

ধুতি, গামছা, জামা, সোয়েটার, কম্বল, তোষক, বালিশ, চাদর, কেড্‌স্ জুতা, পশমের মোজা, ছাতা, লাঠি, টর্চ, হ্যারিকেন লণ্ঠন, অয়েলক্লথ, দস্তানা, পাজামা, পশমের পা-টানা, পানের মশলা, সাগু, মিছরী, ইসবগুল, মাথার তেল।

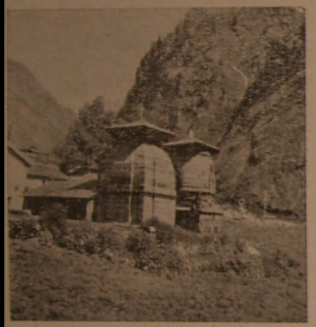

কেদার-বদরীর পথে প্রতি ২।৩ মাইল অন্তর চটি আছে। নিম্ন লিখিত স্থানগুলির পাশে যে সংখ্যা দেওয়া হইল, তাহা পূর্ব্বতন স্থান হইতে পরবর্ত্তী স্থানের 'মাইলে' দূরত্ব জ্ঞাপক। স্থানগুলির পাশে যে সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেওয়া হইল, তাহার অর্থ ফুটনোটে দ্রষ্টব্য।

হরিদ্বার	রামওয়াড়া ৪ +	যোশীমঠ ৬॥ + * ০০:
হৃষিকেশ ১৪ + * ০০	**কেদারনাথ** ২॥ + :	বিষ্ণুপ্রয়াগ ২
দেবপ্রয়াগ ৪৪ + * ০০:		বলদেও ১ +
কোল্টা ১০ *	এখান হইতে আবার	পাণ্ডুকেশ্বর ৫ + *
শ্রীনগর ১১ + * ০০	নালা ২৩	লামবগড় ২॥ +
ছান্তিখাল ১০ *	উখীমঠ ২॥ + * ০:	হনুমান চটি ৪ +
রুদ্রপ্রয়াগ ৭॥ + * ০০	দোগল ভীটা ১০ *	**বদরীনাথ** ৫ + * ০০
রামপুর ৭	বানিয়াকুণ্ড ১ +	
সুওরাগর ২ *	চোপতা ১ +	প্রত্যাবর্ত্তন :
অগস্ত্যমুনি ২॥ + ০	তুঙ্গনাথ ৩ +	চামোলী ৪৮
চন্দ্রাপুরী ৪	মণ্ডল ৯ +	শ্রীনন্দপ্রয়াগ ৭ * ০
ভীরী ২॥ +	গোপেশ্বর ৪॥	সোনলা ৩ *
গুপ্তকাশী ৬ + ০	চামোলী ৩ + * ০০:	কর্ণপ্রয়াগ ১০ + * ০০:
নালা ১	পিপলকুঠী ৯ + * ০০	আদিবদরী ১১ * ০
ফাটা ৭ *	গরুড়গঙ্গা ৪ +	ধুনার ঘাট ১২ *
রামপুর ৪॥ +	পাতালগঙ্গা ৪॥	মেহলচৌরী ৫ * ০
ত্রিযুগীনারায়ণ ৫ +	গোলাপকুঠী ১ *	গণাই ৯॥ + * ০
গৌরীকুণ্ড ৬ + *	কুমার ২ + ০	রাণীক্ষেত ২৬

হরিদ্বার হইতে :

১। যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, ত্রিযুগীনারায়ণ এবং কেদারনাথ হইয়া বদরীনাথ যাইবার সময় ১৫ই এপ্রিল হইতে ৩১শে জুলাই।

২। বদরী-কেদার ১৫ই এপ্রিল হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর।

৩। কেবল বদরীনাথ, এপ্রিলের শেষ হইতে ১৫ অক্টোবর পর্য্যন্ত।

হরিদ্বার হইতে গঙ্গোত্রী : ১৯৩ মাইল। যমুনোত্রী হরিদ্বার হইতে ১৬৬ মাইল
যমুনোত্রী হইতে গঙ্গোত্রী ৯৮ মাইল। গঙ্গোত্রী হইতে কেদারনাথ ১২১ মাইল

সাঙ্কেতিক চিহ্নের অর্থ:— ধর্ম্মশালা +, ইন্সপেকসন বাঙ্গলো *, পোঃ আঃ ০, পোঃ এবং টেলি আঃ ০০, হাসপাতাল:

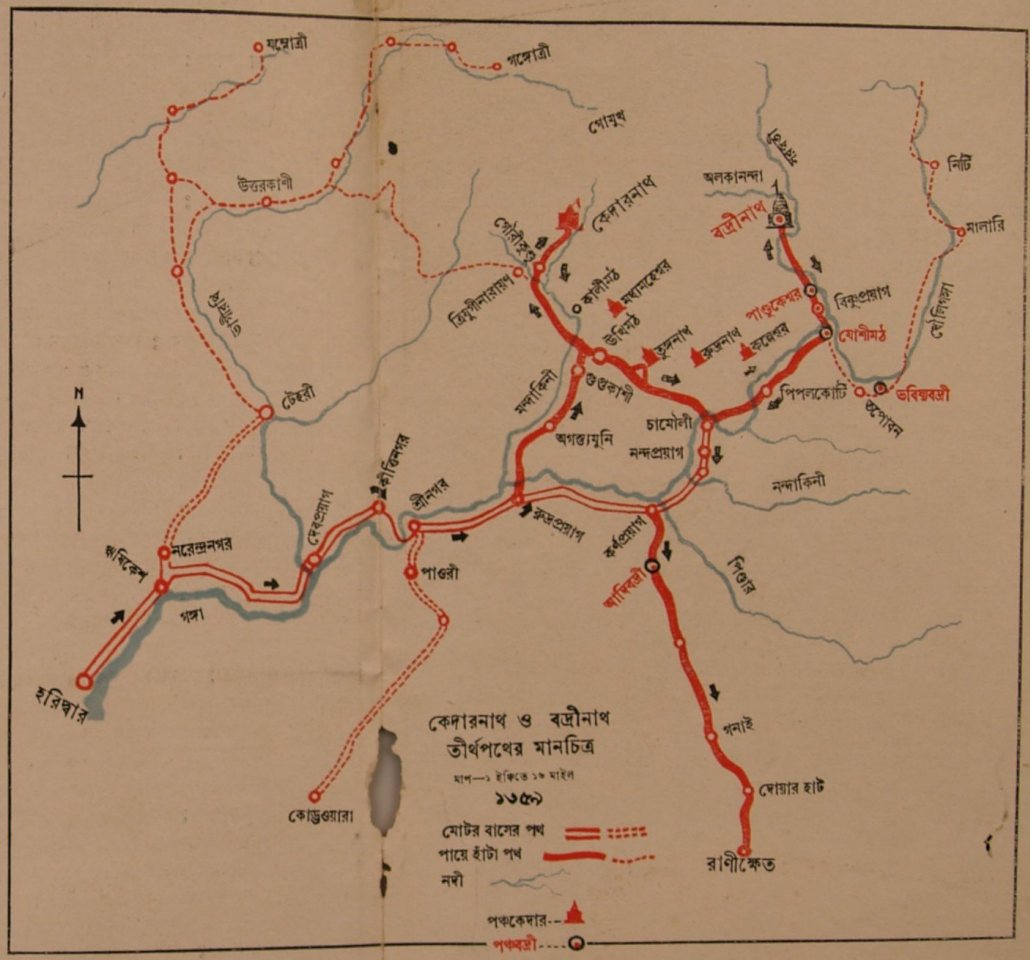

চিত্রে উল্লেখিত স্থান পরিচিতি

দেবপ্রয়াগ : গড়বালের একটি প্রধান কেন্দ্র। বদরীনাথের পাণ্ডাদের বসতি। এখানে রামচন্দ্র মন্দির আছে। ভাগীরথী এবং অলকানন্দার সঙ্গমস্থল।

শ্রীনগর : কেন্দ্রীয় স্থান। কাছাকাছি বহু দেবালয় এবং অন্যান্য লোকালয় আছে। বাজারে বহুপ্রকার দ্রব্য পাওয়া যায়। কেদার বদরী যাত্রীদের জন্য ডাণ্ডী কুলীর আড্ডা।

রুদ্রপ্রয়াগ : এখানে রুদ্রেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে নীচে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম দেখা যায়। মন্দিরে 'রুদ্রেশ্বর' প্রস্তর নির্ম্মিত লিঙ্গ।

গুপ্তকাশী : এ-অঞ্চলের একটি প্রধান স্থান। যাত্রাসম্বন্ধীয় পুস্তক ও চিত্রাদি এখানে পাওয়া যায়। প্রধান মন্দিরের বিগ্রহ বিশ্বেশ্বর। তাহার পাশে আধুনিক পার্ব্বতী মন্দির। সম্মুখে মণিকর্ণিকা কুণ্ড।

ত্রিযুগীনারায়ণ : বৃক্ষহীন গ্রাম। এখানের ত্রিযুগীনারায়ণ মন্দির বিখ্যাত। মন্দিরের উত্তরে ব্রহ্মকুণ্ড ও পশ্চিমে রুদ্র, বিষ্ণু ও সরস্বতী নামে তিনটি ছোট ছোট কুণ্ড আছে। কথিত আছে, এখানে শঙ্কর ও হৈমবতীর বিবাহ হয় এবং সেই বিবাহের হোমাগ্নি তিন যুগ ধরিয়া প্রজ্বলিত রাখা আছে।

কেদারনাথ : তুষার মণ্ডিত গিরি-প্রাচীরের ক্রোড়ে কেদারনাথ। কেদারনাথের মন্দির উচ্চ মঞ্চের উপর নির্ম্মিত। গঠন ও অবস্থান দুই মহান। অবারিত দ্বার মন্দির। বিগ্রহ মহিষের পিঠের আকারের স্বাভাবিক এক প্রকাণ্ড প্রস্তর। মন্দিরের জগমহোনে কতকগুলি প্রাচীন প্রস্তর মূর্তি এবং মধ্যস্থলে পিতলের একটি বৃষ মূর্তি আছে। মন্দির বৈশাখ হইতে আশ্বিন—ছয় মাস খোলা থাকে। বাজারে নানা দ্রব্যের দোকান আছে। উচ্চতা প্রায় ১২০০০ ফুট। তিনদিকে পর্ব্বত বেষ্টিত। এখান হইতে নিকটের মন্দাকিনী ও দুধগঙ্গার গর্জ্জন শোনা যায়।

উখীমঠ : কেদারের রাওল সাহেবের বাসস্থান এবং তাঁহার অধীন দেবস্থানগুলির কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়। এখানে আছে ওঁকারনাথের বিশাল মন্দির, মন্দিরে আছে মান্ধাতার, কেদারনাথের ও মধ্যমেশ্বরের মূর্তি। শীতকালে কেদার ও মধ্যমের নিজ নিজ মন্দির যখন বন্ধ থাকে, তখন এইখানে তাঁহাদের পূজা চলে। ওঁকারনাথ পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গ। উখীমঠ এ-অঞ্চলের বিশিষ্ট শহর।

শ্রীতুঙ্গনাথ : মন্দাকিনী ও অলকানন্দার উপত্যকাদ্বয়ের শীর্ষদেশে প্রায় ১২০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। বসতিটি ছোট, জনবিরল এবং বৃক্ষহীন। এখান হইতে কেদার বদরী তুষারমণ্ডিত গিরিরাজি দেখা যায়। শ্রীতুঙ্গনাথের মন্দির প্রাচীন এবং বিশাল। শ্রীতুঙ্গনাথ পঞ্চকেদারের এক কেদার। শীতের ছয়মাস শ্রীতুঙ্গনাথে মন্দির বন্ধ থাকে।

চামোলি : আর এক নাম লাংগঙ্গা। বিশিষ্ট শহর, গড়বাল জেলার এক সব্‌ডিভিসনের হেড্‌কোয়ার্টার্স। নীচে অলকানন্দা বহিতেছে। বাজার দোকান আছে।

গরুড়গঙ্গা : এখানে গরুড়ের ছোট মন্দির আছে, তাহার নীচে গরুড়গঙ্গাতে স্নানের ঘাট।

যোশীমঠ : প্রাচীন স্থান। শ্রীবদরীর রাওল সাহেবের বাসস্থান ও দপ্তর এখানে আছে। রাওল সাহেবের মঠ-সংলগ্ন নৃসিংহ দেবী প্রভৃতি দেবতার স্থান। ইহা চারিদিকের পথের মিলন-কেন্দ্র। দক্ষিণে কুমাওনে যাতায়াতের পথ আছে। এখান হইতে ৯ মাইল পূর্বে তপোবন নামক প্রাচীন স্থান।

"মহাপ্রস্থানের পথে"

পূর্বালাপ

যুগ-যুগান্তর কাল থেকে ভারতবাসীর অন্তর তীর্থযাত্রার কথা ও কল্পনায় বৈরাগ্যচঞ্চল হয়ে উঠে তীর্থপথের পথিকের পদচিহ্ন অনুসরণ করে' আবহমান কাল ধরে' ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতবাসীর মনে গড়ে' উঠেছে। অধ্যাত্মজীবন সন্ধানের জন্য এদেশের ভক্তিপিপাসু এবং আনন্দভিক্ষু মানুষ বারম্বার ঘর ছেড়ে ছুটে গিয়েছে অজানা সমুদ্রতীরে, গহন অরণ্যলোকে, দুর্গম গিরিগুহায়, দুরারোহ পর্বতমালায়। ধনী নির্ধন, অশক্ত অক্ষম, পঙ্গু ভঙ্গুর—সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর অন্তরে চিরকাল ধ্বনিত হয়ে এসেছে দূর দুর্গম তীর্থপথের ডাক। প্রাচীন ভারতের মহাত্মা বেদব্যাস, গৌতম বুদ্ধ, আচার্য্য শঙ্কর, গুরু নানক, কবীর, রামানুজ, তীর্থঙ্কর—তাঁদের মর্মলোকেও একদা এই ডাক এসে পৌঁছেছিল। কালান্তরক্রমে একালের রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র— তাঁরাও সঙ্কটসঙ্কুল তীর্থযাত্রার অচ্ছেদ্য আকর্ষণে ঘর ছেড়ে বার বার বেরিয়ে পড়েছিলেন। কেউ খুঁজেছেন দেবত্বলাভের পথ, কেউ চেয়েছেন সাধু-মহাত্মা-মহাপুরুষের দিব্যদর্শন, কেউ বা সন্ধান করেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে কোনো নির্জন নিভৃত পার্বত্য তপোবনে তপস্যার আশ্রম। এই ভাবে কালক্রমে ভারতবর্ষের সকলপ্রকার ঐতিহ্য-কীর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে যুগযুগান্তরের মহাপুরুষগণের পরম পুণ্য অবদানে। সমগ্র ভারতখণ্ডে, জম্বুদ্বীপে, সাগরে, প্রান্তরে, মরুলোকে, অনামা নদীতীরে, বিজন ভীষণ অরণ্যপথে, হিমালয়ের গিরিসঙ্কটের স্তরে স্তরে—তাঁরা আপন আপন মহিমা ও কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছেন মন্দিরে আর প্রস্তরে, প্রতিমায় আর বিগ্রহে, স্থাপত্যে আর ভাস্কর্যে, তপোবনে আর গিরিগুহায়। ঐতিহাসিক কালে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে তরুণ যুবক শ্রীশ্রীমৎ শঙ্করাচার্য মহাভারতধর্ম্মের আকর্ষণে গিয়েছিলেন চিরতুষারমৌলী হিমালয় পর্বতমালার বিঘ্নসঙ্কটের জটিলতার মাঝখানে। সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভগবান কেদারনাথ ও বদরীনাথের বিশ্ববিশ্রুত দেবস্থান। আচার্য শঙ্করের সেই উত্তরধামের আকর্ষণে যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ তীর্থপথিক হিমালয় পর্বতের তুষারধবল প্রান্তরের দিকে অভিযান করেছেন। তাঁরা গিয়েছেন তপোলোক পেরিয়ে দেবলোকের দিকে,—দেবলোক পেরিয়ে ব্রহ্মলোকে। তাঁদের সেই ভ্রমণবৃত্তান্ত ভারতবাসীকে শত শত বছর ধরে' অধ্যাত্ম আনন্দের প্রতি আকৃষ্ট করে' এসেছে। এই পথের পথিকমাত্রেই জানেন, এই তীর্থযাত্রার সুদীর্ঘ পথ প্রতি বৎসর নববসন্ত সমাগমে আনন্দে আবেগে শ্রদ্ধায় ভক্তি-বিহ্বলতায় বেদনায় পিপাসায় যন্ত্রণায় বল্গনায় নিত্য মুখর হয়ে ওঠে। প্রাচীন কালের কবিগুরু বেদব্যাস তাঁর মহাভারতে স্বর্গারোহণের বর্ণনায় এই তীর্থপথকেই **'মহাপ্রস্থানের পথে'** বলে অভিহিত করেছিলেন।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

— মহাপ্রস্থানের পথে —

কুশী-লবগণ

প্রবোধ : বসন্ত চৌধুরী। গোপাল ঘোষ : তুলসী চক্রবর্ত্তী। ব্রহ্মচারী : অভি ভট্টাচার্য্য।
জ্ঞানানন্দ : শিশির বটব্যাল।
পাগলা সাধু : নীতিশ মুখোপাধ্যায়।
অঘোর নাথ : গৌরীশঙ্কর।
চৌধুরী মশাই : ললিত চট্টোপাধ্যায়।
অমরা সিং : নটবর। পণ্ডিত শুকুল : কমল মিত্র।
অন্ধ : মনোজ চট্টোপাধ্যায়। খঞ্জ : কেষ্ট দাস।
রাণী : অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়। রাধারাণী : মায়া মুখোপাধ্যায়। নারায়ণগিরিমায়ী : মলিনা দেবী।
দিদিমা : রাজলক্ষ্মী। পিসি : বন্দনা দেবী।
বামুন বুড়ী : মনোরমা। চাকর মা : আশালতা।
রাধারাণীর মা : মায়া বোস।
রাঙ্গাশাড়ী : রমা দেবী। নির্ম্মলা : কনকলতা। বিজয়া : মুকুলজ্যোতি। ভৈরবী : প্রতিমা বোস।
গাড়োয়ালি মেয়ে : জয়শ্রী সেন।

— সংগঠনে —

পরিচালক : কাত্তিক চট্টোপাধ্যায়।

সুর-শিল্পী : পঙ্কজ কুমার মল্লিক। চিত্র শিল্পী : অমূল্য মুখোপাধ্যায়। শব্দ-যন্ত্রী : শ্যামসুন্দর ঘোষ।
শিল্প-নির্দ্দেশক : সুধেন্দু রায়। সম্পাদক : সুবোধ রায়। রসায়নাগারাধ্যক্ষ : পঞ্চানন নন্দন।
সেট-শিল্পী : পুলিন ঘোষ। পট-শিল্পী : রামচন্দ্র সেণ্ড। গীতকার : পণ্ডিত ভূষণ, বি এম্ শর্ম্মা।
মঞ্চ সজ্জাকর : রবি চট্টোপাধ্যায়। স্থির চিত্র : দীনেশ দাস। রূপসজ্জা : মদন পাঠক। পরিচ্ছদ ব্যবস্থাপক : যতীন কুণ্ডু। শিল্পী-সংগ্রাহক : বীরেন দাস। ব্যবস্থাপক : ছবি ঘোষাল ও কেষ্ট হালদার।

— সহকারীবৃন্দ —

পরিচালনায় : ধীরেন্দ্রনাথ সাহা, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত ভূষণ, নির্ম্মল মিত্র।
সুর-শিল্পে : বীরেন বল। চিত্র-শিল্পে : জ্ঞান কুণ্ডু, দুর্গা রাহা, নরেন মজুমদার।
শব্দ-যন্ত্রে : প্রদ্যোৎ সরকার। রসায়নাগারে : বলাই ভদ্র, অবনী মজুমদার, তারাপদ চৌধুরী।
সেট-নির্ম্মানে : রতন প্যাটেল। রূপসজ্জায় : নারায়ণ মজুমদার, গোপাল হালদার।
শিল্প-নির্দ্দেশনায় : প্রহ্লাদ পাল। স্থির-চিত্রে : প্রীতিকর হালদার, ভোলানাথ কয়াল।
শিল্পী-সংগ্রহ : বীরেন দাস। ব্যবস্থাপনায় : হরেন হালদার।

— কৃতজ্ঞতা স্বীকার —

কেদার বদরীনাথ মন্দির কমিটির সেক্রেটারী শ্রীপুরুষোত্তম দাস বাগোয়াড় : নৌরেন সেন, রাখহরি দত্ত। বদরীনাথের পাণ্ডা সূর্য্য প্রসাদ (পঙ্কভাই), দেবপ্রয়াগ, গাড়োয়াল। কেদারনাথের পাণ্ডা কিশোরী প্রসাদ শুকলা, পোঃ গুপ্তকাশী, গাড়োয়াল। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে।

একমাত্র পরিবেশক : অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড।

মহাপ্রস্থানের পথে

প্রবোধকুমার সান্যাল

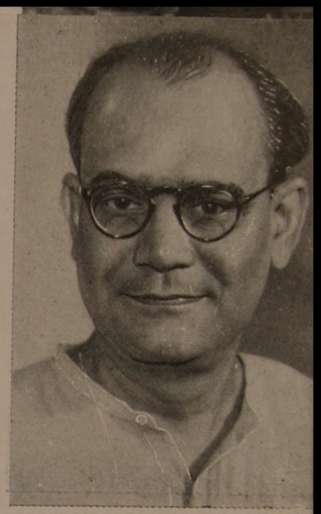

ভারতীয় সাংস্কৃতির একটি প্রধান পরিচয় ভারতবর্ষের অসংখ্য তীর্থস্থান। ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্প শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছে তীর্থ পথের দেবমন্দিরে। এই তীর্থ-পথ যত দুর্গমই হোক, তারা আপন আপন মহিমায় চিরকাল ধরে' মানুষকে আকর্ষণ করেছে। পুণ্যলাভের কামনায় মানুষ গিয়েছে বনে জঙ্গলে, ছুটেছে সমুদ্রপথে, ঝাঁপ দিয়েছে অনাম্য নদীর তুফান-তরঙ্গে, পেরিয়ে গেছে দুঃসাধ্য মরপ্রান্তর—জীবন-মৃত্যুকে তুচ্ছ করেছে পদে পদে। বাধা, ক্লান্তি, উপবাস একদিকে—অন্যদিকে নৈরাশ্য, আতঙ্ক, ব্যাধি-বিকার—কিন্তু মানুষ ওদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেনি। দুর্লভের আকর্ষণ সকল বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গেছে।

ভারতের শিয়রে আবহমান কাল থেকে নগরাজ হিমালয় যেন মহাযোগে আসীন। তাঁর ললাটের জটা-জটিলতার থেকে নেমে এসেছে অগণ্য স্রোতস্বিনী—তারা যেন সেই দেবাদিদেবের আনন্দেরই ধারা। মহাযোগীর শিরশ্চূড়া চিরতুষারে আবৃত; তাঁর অঙ্গের স্তরে স্তরকে তীর্থ-মন্দীরগুলি মণিমাণিক্যের মত জাজ্বল্যমান। ওদের মধ্যে বদরিনাথ, কেদারনাথ, কৈলাসনাথ—ইত্যাদির দর্শন কোটি কোটি নর-নারীর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য। ওদের ওই বিশালতার মহিমা মানুষকে যেন দেবলোক থেকে আহ্বান জানায়—সেই আহ্বান শুনে

একদিন তীর্থযাত্রীর দল আত্ম-বিস্মৃত অস্থিরতায় ওই দুঃসাধ্য দুর্গম তীর্থের পথে বেরিয়ে পড়ে। সংসারের মায়া, স্বজনের মমতা, সম্পদের মোহ—সমস্তই তাদের পিছনে পড়ে থাকে।

একদিন হঠাৎ আমিও বেড়িয়ে পড়েছিলাম ওই সুদূর হিমালয়ের তীর্থপথে। মনে পড়ে আমার তখন বাসা ছিল হরিদ্বারে। কিন্তু যাবার আগে আমার মনে ছিল জটিল প্রশ্ন, ছিল উদ্দীপনা, ছিল ভয়-ভাবনা। হয়ত পরমার্থ লাভের অস্পষ্ট কোন জটিল ক্ষুধাও তখন তরুণ মনে বাসা বেঁধে ছিল; হয়ত বা সংশয়াচ্ছন্ন মন অজ্ঞানের অন্ধকারে কোথাও কিছু খুঁজে পাবার জন্যও এখানে ওখানে হাতড়ে ফিরছিল। মনে পড়ে সেদিন চিত্তলোকে একটা প্রবল আলোড়ন এবং প্রবলতর ঝড়-ঝাপটা বয়ে চলেছে।

নিজের ভিতরকার তাড়না আমাকে বারবার ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে ভারত-পরিক্রমায়। সেতুবন্ধে, কোনারকে, সোমনাথে প্যাগোডায়, দ্বারকায়, অজন্তায়, লাডিখানায়—সেই পরিক্রমা কিন্তু শেষ হয়নি। সেদিন সেই অন্তর-তাড়নাই বুঝি আমাকে নিয়ে চলেছে হৃষিকেশ ছাড়িয়ে, দেবপ্রয়াগ পেরিয়ে। বাইরে হিমালয়ের অনন্ত নিস্তব্ধ মহাশান্তি—কিন্তু আমার মধ্যে নিগূঢ় অসন্তোষ, আর অতৃপ্তি—আমার সন্ধানী মন ফিরছে পথে পথে। কিছু আমার চাই, কিন্তু তার সত্য স্বরূপ আমার জানা নেই। অনেক সময় যেতে হয়েছে লোকচক্ষুর বাইরে; অনেক সময় বা পিছন ফিরে নিজের পায়ের চিহ্নও মুছে দিয়ে যেতে হয়েছে। নিজের প্রশ্ন নিজেই কান পেতে শুনতুম—। একথা জানতুম সে-প্রশ্ন উঠে দাঁড়ায় অস্তিত্বের মূল কেন্দ্র থেকে—যেটাকে বলে পরম পিপাসা, প্রাণসত্তার অন্তহীন অতৃপ্তি—যার থেকে উদ্ভাবন ঘটে ভগবৎ-সৌন্দর্যবোধের, আত্মোপলব্ধির, মহৎ আনন্দের, কাব্যসাহিত্যের।

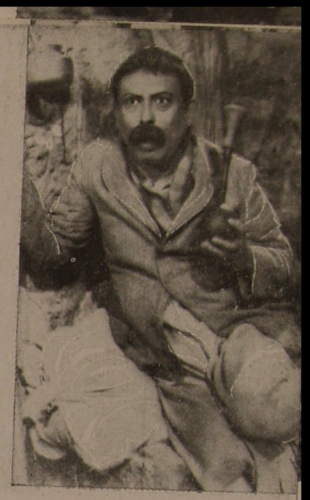

মনে পড়ছে হরিদ্বারে প্রথম আলাপ ব্রহ্মচারী আর জ্ঞানানন্দের সঙ্গে। কৌতুকপ্রিয়, চটুল, সদানন্দ এবং ঔদরিক ব্রহ্মচারী। সন্দেহ ছিল, সে মেদিনীপুরের কোন এক বিপ্লববাদীদলের লোক। পুলিশের চোখ এড়িয়ে সে পাহাড় পর্বতে আত্মগোপন করেছে—কিন্তু আমার গ্রন্থে সেকথা সেদিন প্রকাশ করা বিপজ্জনক ছিল। মনে পড়ছে হৃষিকেশের কালীকম্বলীবাবার ওখানে প্রথম আলাপ গোপাল ঘোষের সঙ্গে। তিনি আমাকে দেখেই চিনলেন, আমি নাকি জাতসাপ। তারপর একে একে সবাই। বামুনবুড়ি, নুজদেহ চারুর মা, নির্মলা, রাঙ্গাশাড়ী, মনসাতলার মাসী, পণ্ডিতজী, সুকুল আর সাধু। ওরা সবাই সাধারণ—অতি সাধারণ—কিন্তু ওই অন্তহীন গিরিপথের বিচ্ছিন্ন জগতে ওরা ছিল অপার্থিব, ছিল অনন্যসাধারণ। ওদের ভক্তি, অনুরাগ, অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

বিজনী, ছান্তিখাল, ব্যাঘট, দেবপ্রয়াগ পেরিয়ে আবার জুটলো নতুন সঙ্গী। অঘোরবাবু, রাধারাণী আর তার মা। রাধারাণী

স্বভাবকোমল—সে তীর্থে এসেছে পুণ্যলাভের কামনায়। সহোদরার মত তার আচরণ, নিষ্কলুষ তার মন। হঠাৎ রামপুর চটিতে অঘোরবাবুর সঙ্গে বিতর্ক বাধলো ব্রহ্মচারীর। হঠাৎ নাটকীয় ভাবে জানলুম, রাধারাণী এক পতিতা নারী। ঘটনাচক্রে সেদিন একা চলে গিয়েছিলুম নিজের পথে।

মনে পড়ছে ঠিক সেইদিন সন্ধ্যারাত্রির কথা। চন্দ্রা আর মন্দাকিনীর সঙ্গমে অন্ধকারে আমার পথ হারানো। চারিদিকে বনময় পর্বত, অন্ধকারে ভয়চকিত আমার মন। সহসা পিছনে ছমছমিয়ে এসে দাঁড়ালো এক ভৈরবী। সর্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষের অলঙ্কার, পরনে গৈরিকবাস, দুই হাতে শিঙ্গা, আর কমণ্ডলু। চঞ্চল এক পাহাড়ী মেয়ে। মেয়েটি সেদিন পরদেশী পরিব্রাজককে নদীসঙ্গম পার করিয়ে পথ দেখিয়ে চলে গিয়েছিল। গিয়েছিল নদীতীরের পথে—অন্ধকার অজানায়। তার সেই আকস্মিক আবির্ভাব আজও আমার কাছে রহস্যভরা। আজও তা'র কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি।

চন্দ্রাপুরী ছেড়ে আবার চললুম নিজের পথে। পিছনে পড়ে রইলো রুদ্রপ্রয়াগ, আর সেই রুদ্রপ্রয়াগের ঘাটের পাশে সেই মাতৃ-রূপিনী নারায়ণগিরিমায়ীর আশ্রম—তাঁর পাশে সেই দুটি শীর্ণকায়া তরুণী সন্ন্যাসিনী—সোনি আর রোপ্পি। আর রইলো পিছনে গুপ্তকাশী, ত্রিযোগী-নারায়ণ, গৌরীকুণ্ড, চীরবাসা ভৈরব আর রামওয়াড়া—শীতার্ত দেহে তুষার বর্ষণের ভিতর দিয়ে পৌঁছেছিলুম কেদারনাথে। রোগে, জ্বরায়, যন্ত্রণায়—কত যাত্রী পিছনে পড়ে রইলো, তাদের কথা আজও ভুলতে পারিনি। ভুলতে পারিনি কেদারনাথের সেই উত্তুঙ্গ ধবল মহিমা, ভুলতে পারিনি যন্ত্রণা-জর্জর তীর্থযাত্রীর আত্মহারা ভক্তি-বিহ্বলতা। সেদিন আমাদের পিছনের পথ তুষারপাতের ফলে লুপ্ত হ'য়েছিল।

মনে পড়ছে মন্দাকিনীর পুল পেরিয়ে পুরাকালের বাণরাজার দেশে পৌঁছান। বাণরাজার কন্যা উষার নামে উখীমঠ। প্রাণান্তকর চড়াই পথ ছিল প্রায় চারদিন। তারপর তুঙ্গনাথ আর পাঙ্গরবাসার অরণ্য। ওই পথে গোপালদার রসরসিকতা, বামুন বুড়ীর কচকচি, আর চারুর মার মুখ থেকে তার গৃহপালিত গরুর গল্প। সেই নিস্তব্ধ পার্বত্য উপত্যকাতেও সেদিন বাস্তব জীবনের কলরব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। এমনি করে বাইশ দিন হেঁটে চামোলির ধর্মশালায় এসে আমি রোগশয্যায় শুয়েছিলাম। বদরীনাথ পৌঁছতে তখনো চারদিন বাকী।

অলকানন্দায় অবগাহন-স্নানের ফলে সেদিন আমার ব্যাধিবিকার শান্ত হয়েছিল। তারপর পিপলকুঠী, গরুড়গঙ্গা, কুমারচটি, আর সিংহদ্বার পেরিয়ে যোশীমঠে পৌঁছেছিলুম। কত গঙ্গা পথে পথে। আকাশগঙ্গা, পাতালগঙ্গা, গরুড়গঙ্গা আর ধবলীগঙ্গা, পিন্দারগঙ্গা আর বিষ্ণুগঙ্গা। তারপর পাণ্ডুকেশ্বর আর লামবগড়ের পথ। কত মালেলের পাহাড়, কত পুরাকীর্তি, কত ভুর্জপত্র আর রুদ্রাক্ষের বন! এই পথ দিয়ে স্বর্গারোহণ করেছিলেন পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদী। এদিকে যেন কোথায় আছে নন্দনকানন। এমনি করে গিয়ে পৌঁছলুম হনুমানচটিতে।

হনুমানচটির থেকে বদরীনাথ আন্দাজ পাঁচ মাইল পথ। পথ অতিশয় সঙ্কটাপন্ন ছিল সেদিন—চড়াই পথ ছিল দুঃসাধ্য। পথের এক বাঁকে দূরের থেকে প্রথম চোখে পড়ে বদরীনাথের স্বর্ণচূড়া, সেই দৃশ্যদর্শনে পরিশ্রান্ত যাত্রীর সমগ্র অন্তর মথিত করে' চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু নেমে আসে। তারা ভগ্ন কম্পিত কণ্ঠে কেঁদে ওঠে—জয় বদরী বিশাললাল কি জয়।

আজও ভুলিনি আমার মনে সেদিন ছিল সংশয়ের যন্ত্রণা। দেখলুম জন্মান্ধ যাত্রী চলেছে দেবদর্শনে, দেখলুম নুব্জদেহ, পঙ্গু আর খঞ্জ তীর্থযাত্রী—দেখলুম তাদের অখণ্ড বিশ্বাস। বিশ্বাসের পথ তারা আমাকে দেখিয়েছিল বৈ কি। দেখিয়েছিল আত্মসমর্পণের পথ, অহংবুদ্ধি বিসর্জনের পথ। দেবতাত্মা হিমালয়কে সেদিন আশ্চর্য মনে হয়েছিল।

মন্দিরের বাইরে এসে পথের এক শিলাজতুর দোকানে এক বিধবা তরুণীর সঙ্গে ঘটনাচক্রে আলাপ। মন্ত্রদীক্ষিতা, ব্রহ্মচারিণী, ভক্তিমতী মেয়ে। অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্যে মেয়েটি মুখর, অজস্র আনন্দ-উচ্ছলতায় আত্মবিস্মৃত। তিনি তাঁর নিজের নাম রেখে গেছেন রাণী। উত্তর প্রদেশে তাঁর বাসা—তিনি এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা। মনে পড়ছে সেদিন তিনি আমার কৈলাস ভ্রমণের পথ অবরোধ করেছিলেন। অতঃপর বদরীনাথে তিনি আমাদের দলকে ছেড়ে চলে যান, কিন্তু কয়েকদিন পরে কর্ণপ্রয়াগ থেকে তিনি আমাদের সহগামিনী হন এবং শেষ দিন পর্যন্ত আমরা পাশাপাশি চলতে থাকি। পথে কখনও এসেছে বর্ষা, কখনও বা বসন্ত। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পেরিয়েছি আধবদরী আর পিন্দারগঙ্গার পথ,—মেহলচৌরী, দ্বারীহাট আর রাণীক্ষেত। মনে পড়ছে বনময় পর্বতের সানুদেশে সুশীতল ঝরণার ধারের ছায়াপথে তিনি রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে বসেছেন জপে—দেখেছি তাঁর একাগ্রতা, দেখেছি তাঁর শ্রান্ত আয়তচক্ষে বিড়ম্বিত জীবনের অশ্রুর আভাস। ট্যারাপিসি তাঁকে অসম্মানের আঘাত করেছে, দিদিমা করেছেন সস্নেহ শাসন—কিন্তু সেই আঘাত আর শাসনের খরতাপে পদ্মের কোরক সেদিন শতদলে বিকশিত হয়েছিল। ছবির মতো আজও দেখতে পাই দু'জনে দুই ঘোড়া নিয়ে সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি। পথের দুই পাশে অরণ্য-পুষ্পের সৌরভ প্রসারিত, নির্ঝরের কলতানে মুখরিত—লতাবিতানের ফাঁকে ফাঁকে আমরা বিশাল হিমালয়ের শোভা দেখে দেখে চলে যেতুম। কখনও দেখতুম অস্তাচলের চূড়ায় নেমেছেন সূর্যদেব—চিড় আর পাইনের বনে অরণ্যপক্ষীর সান্ধ্যকাকলীতে মুখরিত পথ, নীচের নদীতে নেমেছে ছায়ান্ধকার। মনে পড়ছে জ্যোৎস্না রাত্রে সেই গগাস চটীর ধার। পাহাড়ের ধারে পাষাণ প্রতিমার মত তিনি আসীন।

জীবন কি ব্যর্থ?—এই ছিল তাঁর প্রশ্ন। আনুষ্ঠানিক জপ তপ সাধনার বাইরে আর কি কোনো সার্থকতার পথ নেই?

রাণীর কোনো প্রশ্নের জবাব ছিল না আমার কাছে। কিন্তু

তাঁর নিশ্বাস পড়েছিল আমার পাশে—সেই নিশ্বাসে পথের দু'পাশের পাইন আর ঝাউয়ের বন ফুঁপিয়ে উঠেছিল।

রেলপথের প্রান্তে এসে একদিন তাঁকে বিদায় নিতে হ'য়েছিল। সেদিন তাঁর দুই চক্ষে উচ্ছ্বসিত ছিল জীবন মথিত করা গভীর প্রশ্ন। বিশ্বাস করো কি ইহকাল? বিশ্বাস করো কি পরকাল আর পুনর্জন্ম? বিশ্বাস করো কি প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী?

সেই প্রশ্নের নিঃশব্দ উত্তর ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে সেদিন ওই অন্তহীন মহাপ্রস্থানের পথে।

পরিশেষে একটি কথা বলে যাই। আমি লেখক, কিন্তু পরিব্রাজক বলেও আমি অনেকের কাছে পরিচিত। আমার জীবনের খণ্ডকালের কাহিনীকে যিনি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করে' ভারতের জনসাধারণের সামনে আজ তুলে ধরলেন তাঁর কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গচ্ছিত রইলো। আমার বইখানির প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং ঔৎসুক্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি। হয়ত অনেকেই জানেন না তিনিও আমার মতো হিমালয়ের দুর্গম তীর্থভ্রমণের পথিক, বহুদেশের বহু দেবস্থান পরিক্রমায় তিনিও সিদ্ধপাদ। এই তীর্থভ্রমণ কাহিনীকে লোক-চক্ষুর সম্মুখে প্রতিফলিত করে' তীর্থযাত্রার প্রতি তিনি তাঁর শ্রদ্ধা এবং একাগ্রতার দুর্লভ পরিচয় স্থাপনা করেছেন।

লেখকের জীবন-কাহিনীকে নিয়ে চিত্রনির্মাণ এদেশে যেমন অভিনব তেমনই অসমসাহসিক প্রচেষ্টা —বিশেষতঃ সেই আধুনিক লেখক যখন সশরীরে জীবিত রয়েছেন।

এই গ্রন্থের চিত্রপরিচালনায় এবং ব্যবস্থাপনায় যে সকল শিল্পী, গুণী, কারুকার ও চিত্রবিশারদগণ সহায়তা করেছেন তাঁদের সঙ্গেও আমার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়ে গেল।

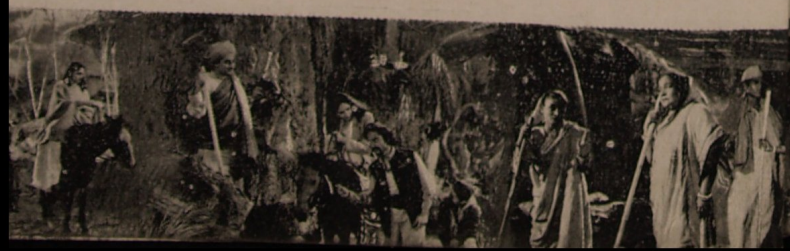

সঙ্গীতাংশ

[১]

সাধুর গান—

রাম নাম ঘনশ্যাম নাম
শিব নাম সিমর দিন রাত
হরি নাম সিমর দিন রাত
জনম সফল তু করলে অপ্না
মান্‌লে মেরী বাত॥
পঞ্চ পাণ্ডবোঁ নে জিস্ পথ্ পে
কিয়া মহাপ্রস্থান
উস পথ পে চলে জো ভী প্রাণী
উস্‌কা হো কল্যাণ।
ভুল যা তু জগকী সব বাতেঁ
ভুল ন পর ইয়ে বাত্॥
— বি. এম, শর্ম্মা

[২]

দ্বিতীয় সাধুর গান—

তু ঢুঁঢ়তা হ্যায় জিস্‌কো বস্তীমেঁ ইয়া কি বনমেঁ
উয়ো সাওয়ারা সলোনা রহতা হ্যায় তেরে মনমেঁ।
মস্‌জিদ মেঁ মন্দিরোঁ মেঁ, পর্ব্বত কী কন্দরোঁ মেঁ
নদিয়োঁকে পানিয়োঁ মে, শহরে সমন্দরোঁ মেঁ
লহরা রহা হ্যায় উয়োহী, খুদ অপনে বাঁকপণ মে॥

[৩]

শিবস্তুতি—

জয় শিব ওঙ্কারা
জয় জয় শিব ওঙ্কারা
ব্রহ্মা বিষ্ণু সদা শিব অর্দ্ধাঙ্গী ধারা,
জয় জয় শিব ওঙ্কারা
ওঁ হর হর হর মহাদেব।
জয় শিব ওঁঙ্কারা জয় শিব ওঁঙ্কারা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু সদা শিব অর্দ্ধাঙ্গী ধারা
শিব ওড়ন মৃগ ছালা
শিব রহতে মত্‌বালা
শিব পার্ব্বতী প্যারা, শিব উপর জলধারা
জয় জয় শিব ওঁঙ্কারা
ওঁ হর হর হর মহাদেব।

[৪]

শিবস্তোত্রম্—

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক্ শূলপাণে
স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো
ভূতেশ ভীত-ভয় সূদন মাম নাথং
সংসার দুঃখ গহন জ্জগদীশ রক্ষ॥
হে পার্ব্বতী হৃদয়-বল্লভ চন্দ্রমৌলে
ভূতাধিপ্ প্রমথনাথ গিরীশ চাপ
হে বামদেবভবরুদ্র পিণাক পাণে
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ
বিশ্বেশ বিশ্ব ভবনাশ্রয় বিশ্বরূপ
বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈক গুণাভিবেশ
হে বিশ্ব-বন্দ্য করুণাময় দীন বন্ধো
সংসার দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥

[৫]

বিষ্ণু স্তোত্রম্—

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতি মহার্ত্তিশান্ত্যৈ
নারায়ণং গরুড় বাহনমব্জনাভম্।
গ্রাহাভিভূতবর বারণ মুক্তি হেতুম্
চক্রায়ুধং তরুণ বারিজ পত্র নেত্রম্।

[৬]

আরতি—

য়ো পাং পুষ্পম্ বেদঃ
পুষ্পবান প্রজাবান পশুমান ভবতি
চন্দ্রমা বা অপাম্ পুষ্পম্
পুষ্পবান প্রজাবান পশুমান ভবতি
যঃ এবম্ বেদঃ য়ো
পামায়তাম্ বেদঃ আয়তবান ভবতি।

[৭]

মীরার ভজন—

সাধন করন চাহীরে মনুয়া ভজন কর ন চাহী
প্রেম লগানা চাহীয়ে মনুয়া প্রীত করন চাহী।
তুলসী পুজন সে হরি মিলে তো
মৈ পুঁজুঁ তুলসী ঝাড়।
পাথ্‌থর পুজন সে হরি মিলে তো
মৈ পুঁজুঁ পহাড়।
দুধ পীনেসে হরি মিলে তো বহুত বৎসওয়ালা
মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে নহী মিলে নন্দলালা।

[৮]

দ্বিতীয় সাধুর গান—

দিলওয়ালে! দিলগীর হুয়া ক্যা
সোচ রহা হ্যায় তু?
সুখ অওর দুখকো সমঝ বরাবর
ধীরজ ধর সাধু।
খোটী দুনিয়া ভলে বুরে কী
কর ন সকে পহ্‌চান
জ্ঞানওয়ান পর কীচ উছালে
মুরখ কো দে মান
তু অপমান কো মান সমঝকর
পোঁছ ডাল আঁসু।

হঁসী-খুশী-আওর রোনা-ধোনা
জগ্‌কে ঝুটে খেল
তন মন-মেঁ জো বনা হ্যায় সবকে
বড়া তু উস্‌সে মেল।
বড়্‌হা কে উস্‌সে মেল—সাধু
মন-পর পা কাবু।
—পণ্ডিত ভূষণ

[৯]

কোরাস—

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর ত্রাহিমাম্
চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর পাহিমাম্।

[১০]

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আয়ে দিব্য ধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণম্ তমসা পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যু মেতি
নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায

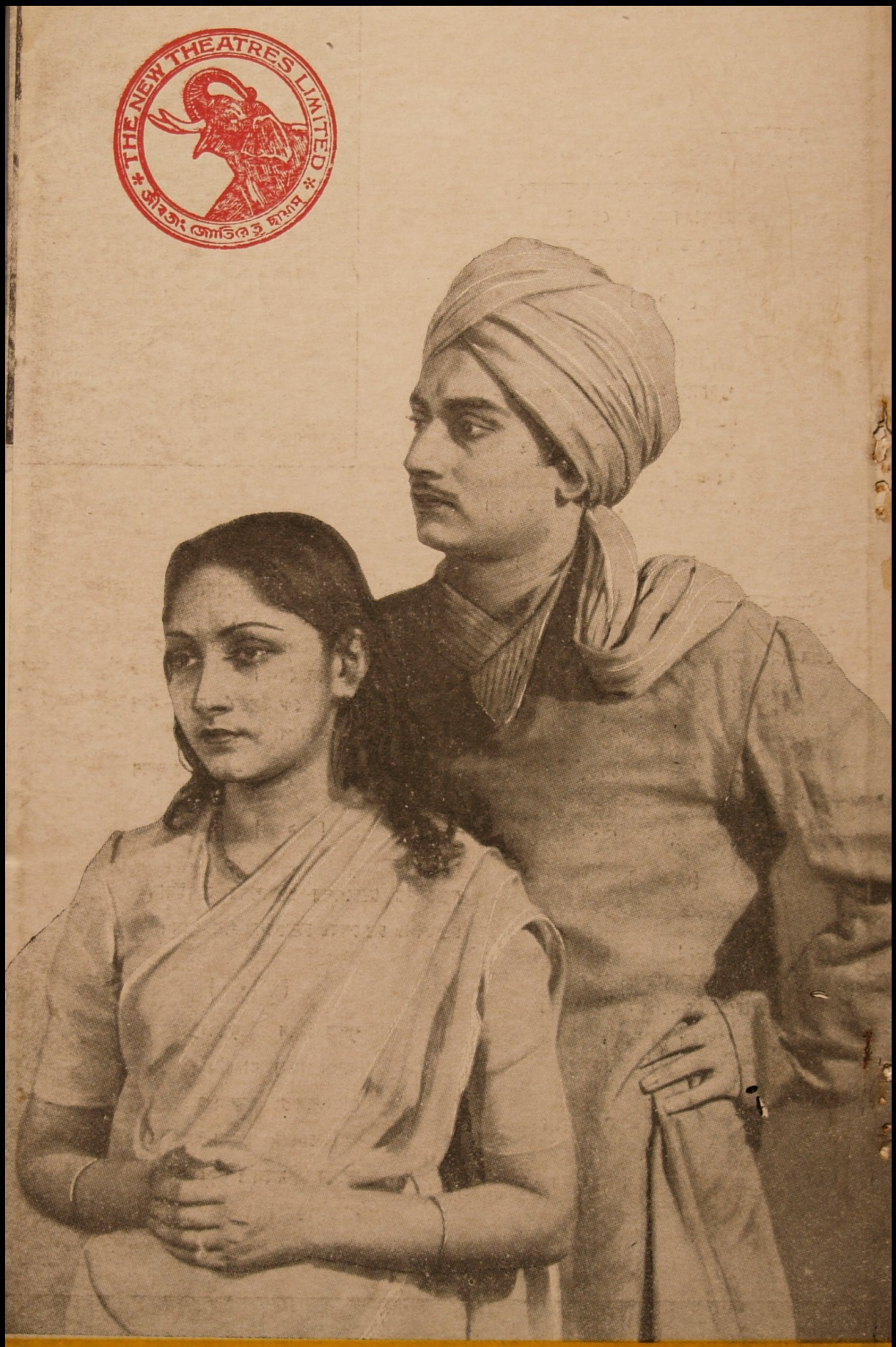

নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ হইতে শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
এবং মহাজাতি আর্ট প্রেস, ১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৫ হইতে মুদ্রিত।

চিত্র-পরিবেশক ঃ—অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ

মহাপ্রস্থানের পথে

ভ্রমন কাহিনী

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

— মহাপ্রস্থানের পথে —

কুশী-লবগণ

প্রবোধ : বসন্ত চৌধুরী। গোপাল ঘোষ : তুলসী চক্রবর্ত্তী। ব্রহ্মচারী : অজিত ভট্টাচার্য্য। জ্ঞানানন্দ : শিশির বটব্যাল। পাগলা সাধু : নীতিশ মুখোপাধ্যায়। অঘোর নাথ : গৌরীশঙ্কর। চৌধুরী মশাই : ললিত চট্টোপাধ্যায়। অমরা দিং : নটবর। পণ্ডিত শুকুল : কমল মিশ্র। অন্ধ : মনোজ চট্টোপাধ্যায়। খঞ্জ : কেষ্ট দাস। রাণী : অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়। রাধারাণী : মায়া মুখোপাধ্যায়। নারায়ণ গিরিবায়ী : মলিনা দেবী। দিদিমা : রাঙ্গলক্ষ্মী। পিসি : বন্দনা দেবী। বামুন বুড়ী : মনোরমা। চারুর মা : আশালতা। রাধারাণীর মা : মায়া বোস। রাঙ্গাপিড়ী : রমা দেবী। নির্ম্মলা : কনকলতা। বিজয়া : মুকুলজ্যোতি। ভৈরবী : প্রতিমা বোস। গাড়োয়ালি মেয়ে : জয়শ্রী সেন।

— সংগঠনে —

পরিচালক : কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়।

সুর-শিল্পী : পঙ্কজকুমার মল্লিক। চিত্র-শিল্পী : অমলা মুখোপাধ্যায়। শব্দ-যন্ত্রী : শ্যামসুন্দর ঘোষ। শিল্প নির্দ্দেশক : সুধেন্দু রায়। সম্পাদক : সুবোধ রায়। রসায়নাগারাধ্যক্ষ : পঞ্চানন নন্দন। সেট-শিল্পী : পুলিন ঘোষ। পট-শিল্পী : রামচন্দ্র সেণ্ডে। গীতকার : পণ্ডিত ভূষণ, বি. এম. শর্ম্মা। মঞ্চ-সজ্জাকর : রবি চট্টোপাধ্যায়। স্থির-চিত্র : দীনেশ দাস। রূপসজ্জা : মদন পাঠক। পরিচ্ছদ ব্যবস্থাপক : যতীন কুণ্ডু। শিল্পী-সংগ্রাহক : ধীরেন দাস। ব্যবস্থাপক : ছবি ঘোষাল ও কেষ্ট হালদার।

— সহকারীবৃন্দ —

পরিচালনায় : ধীরেন্দ্রনাথ সাহা, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত ভূষণ, নির্ম্মল মিত্র।
সুর-শিল্পে : বীরেন বসু। চিত্র-শিল্পে : জ্ঞান কুণ্ডু, দুর্গা রাহা, নরেন মজুমদার।
শব্দ-যন্ত্রে : প্রদ্যোৎ সরকার। রসায়নাগারে : বলাই ভদ্র, অবনী মজুমদার, তারাপদ চৌধুরী।
সেট-নির্ম্মাণে : রতন পাটেল। রূপসজ্জায় : নারায়ণ মজুমদার, গোপাল হালদার।
শিল্প-নির্দ্দেশনায় : প্রহ্লাদ পাল। স্থির-চিত্রে : প্রীতিকর হালদার, ভোলানাথ কয়াল।
শিল্পী সংগ্রহে : ধীরেন দাস। ব্যবস্থাপনায় : খগেন হালদার।

— কৃতজ্ঞতা স্বীকার —

কেদার বদরীনাথ মন্দির কমিটির সেক্রেটারী শ্রীপুরুষোত্তম দাস বাগোহাড়ী, সৌরেন সেন, রাখহরি দত্ত। বদরীনাথের পাণ্ডা সূর্য্য প্রসাদ (পরুভাই), দেবপ্রয়াগ, গাড়োয়াল। কেদারনাথের পাণ্ডা কিশোরী প্রসাদ শুকলা, পোঃ গুপ্তকাশী, গাড়োয়াল। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে।

পরিবেশক : অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড।

মূল্য—তিন আনা

মহাপ্রস্থানের পথে

পূর্বালাপ

যুগ-যুগান্তর কাল থেকে ভারতবাসীর অন্তর তীর্থযাত্রার কথা ও কল্পনায় বৈরাগ্যচঞ্চল হয়ে ওঠে। তীর্থপথের পথিকের পদচিহ্ন অনুসরণ করে' আবহমান কাল ধরে' ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতবাসীর মনে গড়ে' উঠেছে। অধ্যাত্মজীবন সন্ধানের জন্য এদেশে ভক্তিপিপাসু এবং আনন্দভিক্ষু মানুষ বারম্বার ঘর ছেড়ে ছুটে গিয়েছে অজানা সমুদ্রতীরে, গহন অরণ্যলোকে, দুর্গম গিরিগুহায়, দুরারোহ পর্বতমালায়। ধনী নির্ধন, অশক্ত অক্ষম, পঙ্গু ভঙ্গুর—সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর অন্তরে চিরকাল ধ্বনিত হয়ে এসেছে দূর দুর্গম তীর্থপথের ডাক। প্রাচীন ভারতের মহাত্মা বেদব্যাস, গৌতম বুদ্ধ, আচার্য শঙ্কর, গুরু নানক, কবীর, রামানুজ, তীর্থঙ্কর—তাঁদের মর্মলোকেও একদা এই ডাক এসে পৌঁছেছিল। কালান্তরক্রমে একালের রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র—তাঁরাও সঙ্কটসঙ্কুল তীর্থযাত্রার অচ্ছেদ্য আকর্ষণে ঘর ছেড়ে বার বার বেরিয়ে পড়েছিলেন। কেউ খুঁজেছেন দেবত্বলাভের পথ, কেউ চেয়েছেন সাধু-মহাত্মা-মহাপুরুষের দিব্যদর্শন, কেউ বা সন্ধান করেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে কোনো নির্জন নিভৃত পার্বত্য তপোবনে তপস্যার আশ্রম। এই ভাবে কালক্রমে ভারতবর্ষের সকলপ্রকার ঐতিহ্য-কীর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে যুগযুগান্তরের মহাপুরুষগণের পরম পুণ্য অবদানে। সমগ্র ভারতখণ্ডে, জম্বুদ্বীপে, সাগরে, প্রান্তরে, মরুলোকে, অনামা নদীতীরে, বিজন ভীষণ অরণ্যপথে, হিমালয়ের গিরিসঙ্কটের স্তরে স্তরে—তাঁরা আপন আপন মহিমা ও কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছেন মন্দিরে আর প্রস্তরে, প্রতিমায় আর বিগ্রহে, স্থাপত্যে আর ভাস্কর্যে, তপোবনে আর গিরিগুহায়। ঐতিহাসিক কালে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে তরুণ যুবক শ্রীশ্রীমৎ শঙ্করাচার্য মহাভারতধর্মের আকর্ষণে গিয়েছিলেন চিরতুষারমৌলী হিমালয় পর্বতমালার বিঘ্নসঙ্কটের জটিলতার মাঝখানে। সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভগবান কেদারনাথ ও বদরীনাথের বিশ্ববিশ্রুত দেবস্থান। আচার্য শঙ্করের সেই উত্তরধামের আকর্ষণে যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ তীর্থপথিক হিমালয় পর্বতের তুষারধবল প্রান্তরের দিকে অভিযান করেছেন। তাঁরা গিয়েছেন তপোলোক পেরিয়ে দেবলোকের দিকে,—দেবলোক পেরিয়ে ব্রহ্মলোকে। তাঁদের সেই ভ্রমণবৃত্তান্ত ভারতবাসীকে শত শত বছর ধ'রে অধ্যাত্ম আনন্দের প্রতি আকৃষ্ট ক'রে এসেছে। এই পথের পথিকমাত্রেই জানেন, এই তীর্থযাত্রার সুদীর্ঘ পথ প্রতি বৎসর নববসন্ত সমাগমে আনন্দে আবেগে শ্রদ্ধায় ভক্তি-বিহ্বলতায় বেদনায় পিপাসায় যন্ত্রণায় কল্পনায় নিত্য মুখর হয়ে ওঠে। প্রাচীন কালের কবিগুরু বেদব্যাস তাঁর মহাভারতে স্বর্গারোহণের বর্ণনায় এই তীর্থপথকেই **'মহাপ্রস্থানের পথে'** বলে' অভিহিত করেছিলেন।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার

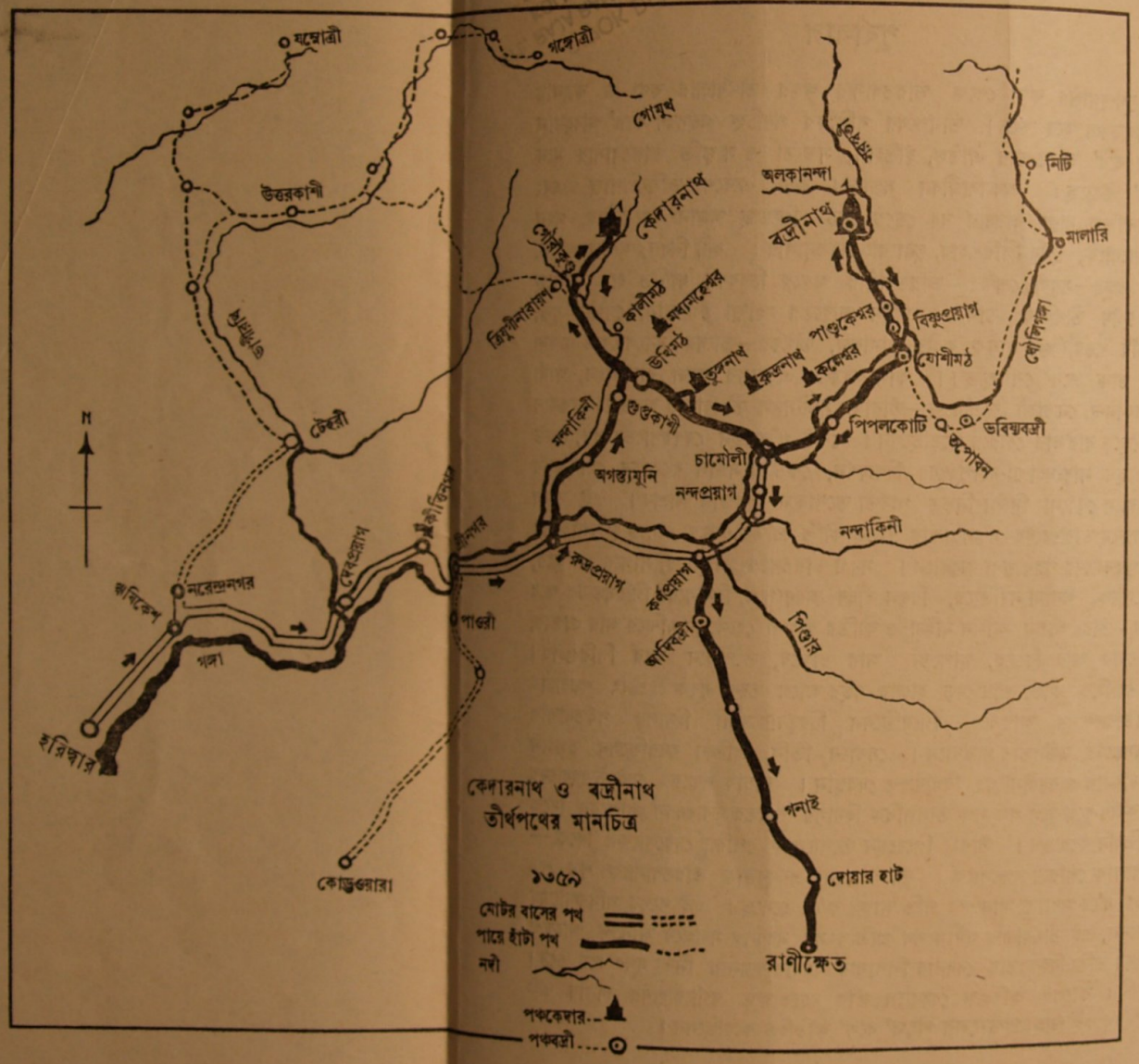

মহাপ্রস্থানের পথে

প্রবোধকুমার সান্যাল

ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রধান পরিচয় ভারতবর্ষের অসংখ্য তীর্থস্থান। ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছে তীর্থ পথের দেবমন্দিরে। এই তীর্থপথ যত দুর্গমই হোক, তারা আপন মহিমায় চিরকাল ধরে' মানুষকে আকর্ষণ করেছে। পুণ্যলাভের কামনায় মানুষ গিয়েছে বনে জঙ্গলে, ছুটেছে সমুদ্রপথে, ঝাঁপ দিয়েছে অনামা নদীর তুফান-তরঙ্গে, পেরিয়ে গেছে দুঃসাধ্য মরুপ্রান্তর—জীবনমৃত্যুকে তুচ্ছ করেছে পদে পদে।—বাধা, ক্লান্তি, উপবাস একদিকে—অন্যদিকে নৈরাশ্য, আতঙ্ক, ব্যাধি-বিকার—কিন্তু মানুষ ওদের কাছে পরাজয় স্বীকার করেনি। দুর্লভের আকর্ষণ সকল বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে গেছে।

ভারতের শিয়রে আবহমান কাল থেকে নগরাজ হিমালয় যেন মহাযোগে আসীন। তাঁর ললাটের জটা-জটিলতার থেকে নেমে এসেছে অগণ্য স্রোতস্বিনী—তারা যেন সেই দেবাদিদেবের আনন্দেরই ধারা। মহাযোগীর শিরশ্চূড়া চির-তুষারে আবৃত; তাঁর অঙ্গের স্তবকে স্তবকে তীর্থ-মন্দিরগুলি মাণমাণিক্যের মত জাজ্বল্যমান। ওদের মধ্যে বদরিনাথ, কেদারনাথ, কৈলাসনাথ-ইত্যাদির দর্শন কোটি কোটি নর-নরনারীর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য। ওদের ওই বিশালতার মহিমা মানুষকে যেন দেবলোক থেকে আহ্বান জানায়—সেই আহ্বান শুনে একদিন তীর্থযাত্রীর দল আত্মবিস্মৃত অস্থিরতায় ওই দুঃসাধ্য দুর্গম তীর্থের পথে বেরিয়ে পড়ে। সংসারের মায়া, স্বজনের মমতা, সম্পদের মোহ—সমস্তই তাদের পিছনে পড়ে থাকে।

একদিন হঠাৎ আমিও বেরিয়ে পড়েছিলাম ওই সুদূর হিমালয়ের তীর্থপথে। মনে পড়ে আমার তখন বাসা ছিল হরিদ্বারে। কিন্তু যাবার আগে আমার

মনে ছিল জটিল প্রশ্ন, ছিল উদ্দীপনা, ছিল ভয়-ভাবনা। হয়ত পরমার্থ লাভের অস্পষ্ট কোন জটিল ক্ষুধাও তখন তরুণ মনে বাসা বেঁধেছিল; হয়ত বা সংশয়াচ্ছন্ন মন অজ্ঞানের অন্ধকারে কোথাও কিছু খুঁজে পাবার জন্যও এখানে ওখানে হাত্‌ড়ে ফিরছিল। মনে পড়ে সেদিন চিত্তলোকে একটা প্রবল আলোড়ন এবং প্রবলতর ঝড়-ঝাপটা বয়ে চলছিল।

নিজের ভিতরকার তাড়না আমাকে বারবার ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে ভারত-পরিক্রমায়। সেতুবন্ধে, কোনারকে, সোয়েডাগন প্যাগোডায়, দ্বারকায়, অজন্তায়, লাণ্ডিখানায়—সেই পরিক্রমা কিন্তু শেষ হয়নি। সেদিন সেই অন্তর-তাড়নাই বুঝি আমাকে নিয়ে চল্‌লো হৃষিকেশ ছাড়িয়ে, দেবপ্রয়াগ পেরিয়ে। বাইরে হিমালয়ের অনন্ত নিস্তব্ধ মহাশান্তি—কিন্তু আমার মধ্যে নিগুঢ় অসন্তোষ, আর অতৃপ্তি—আমার সন্ধানী মন ফিরছে পথে পথে। কিছু আমার চাই, কিন্তু তার সত্য স্বরূপ আমার জানা নেই। অনেক সময় যেতে হয়েছে লোকচক্ষের বাহিরে; অনেক সময় বা পিছন ফিরে নিজের পায়ের চিহ্নও মুছে দিয়ে যেতে হয়েছে। নিজের প্রশ্ন নিজেই কান পেতে শুনতুম—। একথা জানতুম সে-প্রশ্ন উঠে দাঁড়ায় অস্তিত্বের মূল কেন্দ্র থেকে—যেটাকে বলে পরম পিপাসা, প্রাণসত্তার অন্তহীন অতৃপ্তি—যার থেকে উদ্ভাবন ঘটে ভগবৎ-সৌন্দর্যবোধের, আত্মোপলব্ধির, মহৎ আনন্দের, কাব্যসাহিত্যের।

মনে পড়ছে হরিদ্বারে প্রথম আলাপ ব্রহ্মচারী আর জ্ঞানানন্দের সঙ্গে। কৌতুকপ্রিয়, চটুল, সদানন্দ এবং ঔদরিক ব্রহ্মচারী। সন্দেহ ছিল, সে মেদিনীপুরের কোন এক বিপ্লববাদীদলের লোক। পুলিশের চোখ এড়িয়ে সে পাহাড় পর্বতে আত্মগোপন করেছে—কিন্তু আমার গ্রন্থে সেকথা সেদিন প্রকাশ করা বিপদজনক ছিল। মনে পড়ছে হৃষিকেশের কালীকম্বলীবাবার ওখানে প্রথম আলাপ গোপাল ঘোষের সঙ্গে। তিনি আমাকে দেখেই চিনলেন, আমি নাকি জ্ঞাতসাপ। তারপর একে একে সবাই। বামুনবুড়ী, নুজদেহ চারুর

মা, নির্মলা, রাঙ্গাশাড়ী, মনসাতলার মাসী, পণ্ডিতজী, সুকুল আর সাধু। ওরা সবাই সাধারণ—অতি সাধারণ—কিন্তু ওই অন্তহীন গিরিপথের বিচ্ছিন্ন জগতে ওরা ছিল অপার্থিব, ছিল অনন্যসাধারণ। ওদের ভক্তি, অনুরাগ, অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

বিজনী, ছাম্তিখাল, ব্যাঘট, দেবপ্রয়াগ পেরিয়ে আবার জুটলো নতুন সঙ্গী—অঘোর বাবু, রাধারাণী আর তার মা। রাধারাণী স্বভাবকোমল—সে তীর্থে এসেছে পুণ্যলাভের কামনায়। সহোদরার মত তার আচরণ, নিষ্কলুষ তার মন। হঠাৎ রামপুর চটিতে অঘোরবাবুর সঙ্গে বিতর্ক বাধলো ব্রহ্মচারীর। হঠাৎ নাটকীয় ভাবে জানলুম, রাধারাণী এক পতিতা নারী। ঘটনাচক্রে সেদিন একা চলে গিয়েছিলুম নিজের পথে।

মনে পড়ছে ঠিক সেইদিন সন্ধ্যারাত্রির কথা। চন্দ্রা আর মন্দাকিনীর সঙ্গমে অন্ধকারে আমার পথ হারানো। চারিদিকে বনময় পর্বত, অন্ধকারে ভয়চকিত আমার মন। সহসা পিছনে ছমছমিয়ে এসে দাঁড়ালো এক ভৈরবী। সর্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষের অলঙ্কার, পরনে গৈরিকবাস, দুই হাতে শিঙ্গা আর কমণ্ডলু। চঞ্চল এক পাহাড়ী মেয়ে। মেয়েটি সেদিন পরদেশী পরিব্রাজককে নদীসঙ্গম পার করিয়ে পথ দেখিয়ে চলে গিয়েছিল। গিয়েছিল নদীতীরের পথে—অন্ধকার অজানায়। তার সেই আকস্মিক আবির্ভাব আজও আমার কাছে রহস্যভরা। আজও তা'র কোনও ব্যাখ্যা পাইনি।

চন্দ্রাপুরী ছেড়ে আবার চললুম নিজের পথে। পিছনে পড়ে রইলো রুদ্রপ্রয়াগ, আর সেই রুদ্রপ্রয়াগের ঘাটের পাশে সেই মাতৃরূপিনী নারায়ণ-গিরিমায়ীর আশ্রম—তাঁর পাশে সেই দুটি শীর্ণকায়া তরুণী সন্ন্যাসিনী—সোনি আর রোপ্পি। আর রইলো পিছনে গুপ্তকাশী, ত্রিযুগী-নারায়ণ, গৌরীকুণ্ড, চীরবাসা ভৈরব আর রামওয়াড়া—শীতার্ত দেহে তুষার বর্ষণের ভিতর দিয়ে

পৌঁছেছিলুম কেদারনাথে। রোগে, জরায়, যন্ত্রণায়—কত যাত্রী পিছনে পড়ে রইলো, তাদের কথা আজও ভুলতে পারিনি। ভুলতে পারিনি কেদারনাথের সেই উত্তুঙ্গ ধবল মহিমা, ভুলতে পারিনি যন্ত্রণা-জর্জর তীর্থযাত্রীর আত্মহারা ভক্তিবিহ্বলতা। সেদিন আমাদের পিছনের পথ তুষারপাতের ফলে লুপ্ত হ'য়েছিল।

মনে পড়ছে মন্দাকিনীর পুল পেরিয়ে পুরাকালের বাণরাজার দেশে পৌঁছান। বাণরাজার কন্যা উষার নামে উখীমঠ। প্রাণান্তকর চড়াই পথ ছিল প্রায় চারদিন। তারপর তুঙ্গনাথ আর পাঙ্গরবাসার অরণ্য। ওই পথে গোপালদার রসরসিকতা, বামুন বুড়ীর কচকচি, আর চারুর মার মুখ থেকে তার গৃহ-পালিত গরুর গল্প। সেই নিস্তব্ধ পার্বত্য উপত্যকাতেও সেদিন বাস্তব জীবনের কলরব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। এমনি করে বাইশ দিন হেঁটে চামোলীর ধর্ম্মশালায় এসে আমি রোগশয্যায় শুয়েছিলাম। বদরীনাথ পৌঁছতে তখনো চারদিন বাকী।

অলকানন্দায় অবগাহন-স্নানের ফলে সেদিন আমার ব্যাধিবিকার শান্ত হয়েছিল। তারপর পিপলকুঠী, গরুড়গঙ্গা, কুমারচটি, আর সিংহদ্বার পেরিয়ে যোশীমঠে পৌঁছেছিলুম। কত গঙ্গা পথে পথে। আকাশগঙ্গা, পাতালগঙ্গা, গরুড়গঙ্গা; আর ধবলীগঙ্গা, পিন্দারগঙ্গা আর বিষ্ণুগঙ্গা। তারপর পাণ্ডুকেশ্বর আর লামবগড়ের পথ। কত মার্বেলের পাহাড়, কত পুরাকীর্তি, কত ভূর্জপত্র আর রুদ্রাক্ষের বন! এই পথ দিয়ে স্বর্গারোহণ করেছিলেন পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদী। এদিকে যেন কোথায় আছে নন্দনকানন। এমনি করে গিয়ে পৌঁছালুম হনুমানচটিতে।

হনুমানচটি থেকে বদরীনাথ আন্দাজ পাঁচ মাইল পথ। পথ অতিশয় সঙ্কটাপন্ন ছিল সেদিন—চড়াই পথ ছিল দুঃসাধ্য। পথের এক বাঁকে দূরের থেকে প্রথম চোখে পড়ে বদরীনাথের স্বর্ণচূড়া, সেই দৃশ্যদর্শনে পরিশ্রান্ত যাত্রীর সমগ্র অন্তর মথিত করে চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু নেমে আসে। তারা ভগ্ন কম্পিত কণ্ঠে কেঁদে ওঠে—জয় বদরী বিশাললাল কি জয়।

আজও ভুলিনি আমার মনে সেদিন ছিল সংশয়ের যন্ত্রণা। দেখলুম জন্মান্ধ যাত্রী চলেছে দেবদর্শনে, দেখলুম নুব্জদেহ, পঙ্গু আর খঞ্জ তীর্থযাত্রী—দেখলুম তাদের অখণ্ড বিশ্বাস। বিশ্বাসের পথ তারা আমাকে দেখিয়েছিল বৈ কি। দেখিয়েছিল আত্মসমর্পণের পথ, অহংবুদ্ধি বিসর্জনের পথ। দেবতাত্মা হিমালয়কে সেদিন আশ্চর্য মনে হয়েছিল।

মন্দিরের বাইরে এসে পথের এক শিলাজতুর দোকানে এক বিধবা তরুণীর সঙ্গে ঘটনাচক্রে আলাপ। মন্ত্রদীক্ষিতা, ব্রহ্মচারিণী, ভক্তিমতী মেয়ে। অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্যে মেয়েটি মুখর, অজস্র আনন্দ-উচ্ছলতায় আত্মবিস্মৃত। তিনি তাঁর নিজের নাম রেখে গেছেন রাণী। উত্তরপ্রদেশে তাঁর বাসা—তিনি এক বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা। মনে পড়ছে সেদিন তিনি আমার কৈলাস ভ্রমণের পথ অবরোধ করেছিলেন। অতঃপর বদরীনাথে তিনি আমাদের দলকে ছেড়ে চলে যান, কিন্তু কয়েকদিন পরে কর্ণপ্রয়াগ থেকে তিনি আমাদের সহগামিনী হন এবং শেষ দিন পর্যন্ত আমরা পাশাপাশি চলতে থাকি। পথে কখনও এসেছে বর্ষা, কখনও বা বসন্ত। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে পেরিয়েছি আধবদরী আর পিন্দারগঙ্গার পথ,—মেহলচৌরী, দ্বারীহাট আর রাণীক্ষেত। মনে পড়ছে বনময় পর্বতের সানুদেশে সুশীতল ঝরণার ধারের ছায়াপথে তিনি রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে বসেছেন জপে—দেখেছি তাঁর একাগ্রতা, দেখেছি তাঁর শ্রান্ত আয়তচক্ষে বিড়ম্বিত জীবনের অশ্রুর আভাস। ট্যারাপিসি তাঁকে অসম্মানের আঘাত করেছে, দিদিমা করেছেন সস্নেহ শাসন—কিন্তু সেই আঘাত আর শাসনের খরতাপে পদ্মের কোরক সেদিন শতদলে বিকসিত হয়েছিল। ছবির মতো আজও দেখতে পাই দু'জনে দুই ঘোড়া নিয়ে সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছি। পথের দুই পাশে অরণ্য-পুষ্পের সৌরভ প্রসারিত, নির্ঝরের কলতানে মুখরিত—লতাবিতানের ফাঁকে ফাঁকে আমরা বিশাল হিমালয়ের শোভা দেখে দেখে চলে যেতুম। কখনও দেখতুম অস্তাচলের চূড়ায় নেমেছেন সূর্যদেব—চিড় আর পাইনের বনে অরণ্যপক্ষীর সান্ধ্যকাকলীতে মুখরিত পথ, নীচের নদীতে

নেমেছে ছায়ান্ধকার। মনে পড়ছে জ্যোৎস্না রাত্রে সেই গগাস চটীর ধার। পাহাড়ের ধারে পাষাণ প্রতিমার মত তিনি আসীন।

জীবন কি ব্যর্থ?—এই ছিল তাঁর প্রশ্ন। আনুষ্ঠানিক জপ তপ সাধনার বাইরে আর কি কোন সার্থকতার পথ নেই?

রাণীর কোন প্রশ্নের জবাব ছিল না আমার কাছে। কিন্তু তাঁর নিশ্বাস পড়েছিল আমার পাশে—সেই নিশ্বাসে পথের দু'পাশের পাইন ও ঝাউয়ের বন ফুঁপিয়ে উঠেছিল।

রেলপথের প্রান্তে এসে একদিন তাঁকে বিদায় নিতে হ'য়েছিল। সেদিন তাঁর দুই চক্ষে উচ্ছ্বসিত ছিল জীবন মথিত করা গভীর প্রশ্ন। বিশ্বাস করো কি ইহকাল? বিশ্বাস করো কি পরকাল আর পুনর্জন্ম? বিশ্বাস করো কি প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী?

সেই প্রশ্নের নিঃশব্দ উত্তর ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে সেদিন ওই অন্তহীন মহাপ্রস্থানের পথে।

পরিশেষে একটি কথা বলে যাই। আমি লেখক, কিন্তু পরিব্রাজক বলেও আমি অনেকের কাছে পরিচিত। আমার জীবনের খণ্ডকালের কাহিনীকে যিনি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করে ভারতের জনসাধারণের সামনে আজ তুলে ধরলেন তাঁর কাছে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গচ্ছিত রইলো। আমার বইখানির প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং ঔৎসুক্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি। হয়ত অনেকেই জানে না তিনিও আমার মতো হিমালয়ের দুর্গম তীর্থভ্রমণের পথিক, বহুদেশের বহু দেবস্থান পরিক্রমায় তিনিও সিদ্ধপাদ। এই তীর্থভ্রমণ কাহিনীকে লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রতিফলিত করে তীর্থযাত্রার প্রতি তিনি তাঁর শ্রদ্ধা এবং একাগ্রতার দুর্লভ পরিচয় স্থাপন করেছেন।

লেখকের জীবন-কাহিনীকে নিয়ে চিত্রনির্মাণ এদেশে যেমন অভিনব তেমনই অসম-সাহসিক প্রচেষ্টা—বিশেষতঃ সেই আধুনিক লেখক যখন সশরীরে জীবিত রয়েছেন।

এই গ্রন্থের চিত্রপরিচালনায় এবং ব্যবস্থাপনায় যে সকল শিল্পী, গুণী, কারুকার ও চিত্রবিশারদগণ সহায়তা করেছেন তাঁদের সঙ্গেও আমার অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়ে গেল।

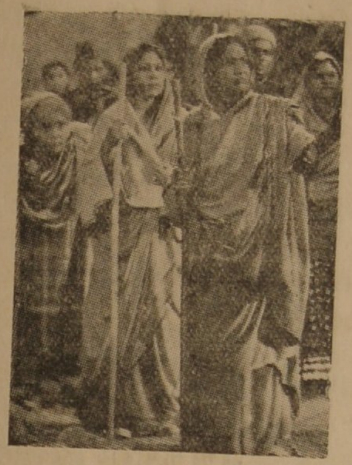

সঙ্গীতাংশ

[১]

সাধুর গান—

রাম নাম ঘনশ্যাম নাম
শিব নাম সিমর দিন রাত
হরি নাম সিমর দিন রাত
জনম সফল তু করলে অপ্না
মানলে মেরী বাত॥
পঞ্চ্ পাণ্ডবোঁ নে জিস্ পথ্
কিয়া মহাপ্রস্থান
উস পথ পে চলে জো ভী প্রাণী
উস্কা হো কল্যাণ।
ভুল যা তু জগকী সব বাতেঁ
ভুল ন পর ইয়ে বাত্॥

—বি, এম্, শর্ম্মা

[২]

দ্বিতীয় সাধুর গান—

তু ঢুঁঢ়তা হ্যায় জিস্কো বস্তীমেঁ ইয়া কি বন মেঁ
উয়ো সাঁওয়ারা-সলোনা রহতা হ্যায় তেরে মন মেঁ।
মস্জিদ মেঁ মন্দিরোঁ মেঁ, পর্ব্বত কী কন্দরোঁ মেঁ
নদিয়োঁকে পানিয়োঁ মে, গহরে সমন্দরোঁ মেঁ
লহরা রহা হ্যায় উয়োহী, খুদ অপ নে বাঁকপণ মেঁ॥
হর জরেঁ মে রমা হ্যয়, হর ফুল্ মে বসা হ্যয়
হর চীজ্মেঁ উসীকা জলওয়া ঝলক রহা হ্যয়
হরকত উয়ো কর রহা হ্যয়, হর ইক্ কে
তন বদন্ মেঁ॥
ক্যা খোয়া? ক্যা কমায়া? কুঁ্য ভায়া
কুঁ্য ন ভায়া?
কুঁ্য সোচে জা রহা হ্যয়? ক্যা পায়া
ক্যা ন পায়া?
সব ছোড় দে উসী পর, বস্তী মে রহ কি বন্ মেঁ॥

—পণ্ডিত ভুষণ

[৩]

শিবস্তুতি—

জয় শিব ওঙ্কারা
জয় জয় শিব ওঙ্কারা
ব্রহ্মা বিষ্ণু সদা শিব অর্দ্ধাঙ্গী ধারা,
জয় জয় শিব ওঙ্কারা
ওঁ হর হর হর মহাদেব।
জয় শিব ওঁঙ্কারা, জয় শিব ওঁঙ্কারা
ব্রহ্মা বিষ্ণু সদা শিব অর্দ্ধাঙ্গী ধারা
শিব ওড়ন মৃগ ছালা
শিব রহতে মত্ বালা
শিব পার্ব্বতী প্যারা, শিব উপর জলধারা
জয় জয় শিব ওঁঙ্কারা
ওঁ হর হর হর মহাদেব।

[৪]

শিবস্তোত্রম্—

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক্ শূলপাণে
স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো
ভূতেশ ভীত-ভয়-সূদন মাম নাথং
সংসার-দুঃখ গহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥
হে পার্ব্বতী হৃদয় বল্লভ চন্দ্রমৌলে
ভূতাধিপ্ প্রমথনাথ গিরীশ জাপ
হে বামদেবভব রুদ্র পিণাক পাণে
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ
বিশ্বেশ বিশ্ব ভবনাশ্রয় বিশ্বরূপ
বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈক গুণাভিবেশ
হে বিশ্ব-বন্দ্য করুণাময় দীন বন্ধো
সংসার-দুঃখ-গহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥

[৫]

বিষ্ণু স্তোত্রম্—

প্রাতঃ স্মরামি ভবভীতি মহার্ত্তিশান্ত্যৈ
নারায়ণং গরুড় বাহনমব্জনাভম্।
গ্রাহাভিভূতবর বারণ মুক্তি হেতুম্
চক্রায়ুধং তরুণ বারিজ পত্র নেত্রম্।

[৬]

আরতি—

য়ো পাং পুষ্পম্ বেদঃ
পুষ্পবান প্রজাবান পশুমায় ভবতি
চন্দ্রমা বা অপাম্ পুষ্পম্
পুষ্পবান প্রজাবান পশুমান ভবতি
য়ঃ এবম্ বেদঃ য়ো
পামায়তাম্ বেদঃ আয়তবান ভবতি।

[৭]

মীরার ভজন—

সাধন করনা চাহীরে মনুয়া ভজন করনা চাহী
প্রেম লগানা চাহীরে মনুয়া প্রীত করনা চাহী।
তুলসী পুজন সে হরি মিলে তো
মৈঁ পুঁজুঁ তুলসী ঝাড়।
পাথ্থর পুজন সে হরি মিলে তো
মৈঁ পুঁজুঁ পহাড়।
দুধ পীনেসে হরি মিলে তো বহুত বৎসওয়ালা
মীরা কহে বিনা প্রেমসে নহী মিলে নন্দলালা।

[৮]

দ্বিতীয় সাধুর গান -

দিলওবালে! দিলগীর হুয়া ক্যা
সোচ্ রহা হুয় তু?
সুখ অওর দুখকো সমঝ বরাবর
ধীরজ ধর সাধু।
খোটী দুনিয়া ভলে বুরে কী
কর ন সকে পহ্চান্
জ্ঞানওয়ান পর কোচ উছালে
মুরখ কো দে মান
তু অপমান কো মান সমঝকর
পোঁছ ডাল আঁগু।
হঁসী-খুশী-অওর রোনা ধোনা
জগ্কে ঝুটে খেল
তন-মন-মেঁ জো বসা হায় সবকে
বড়া তু উস্সে মেল
বড়্হা কে উস্সে মেল—সাধু
মন পর পা কাবু।

—পণ্ডিত ভূষণ

[৯]

কোরাস—

চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর ত্রাহিমাম্
চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর চন্দ্রশেখর পাহিমাম্।

[১০]

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আয়ে দিব্য ধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণম্ তমসা পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যু মেতি
নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

কেদার-বদরীর পথে প্রতি ২।৩ মাইল অন্তর চটি আছে। নিম্নলিখিত স্থানগুলির পাশে যে সংখ্যা দেওয়া হইল, তাহা পূর্ব্বতন স্থান হইতে পরবর্ত্তী স্থানের 'মাইলে' দূরত্ব জ্ঞাপক। স্থানগুলির পাশে যে সকল সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেওয়া হইল, তাহার অর্থ ফুটনোটে দ্রষ্টব্য।

হরিদ্বার
হৃষিকেশ ১৪+*০০
দেবপ্রয়াগ ৪৪+*০০ঃ
কোণ্টা ১০ *
শ্রীনগর ১১+*০০
ছান্তিখাল ১০ *
রুদ্রপ্রয়াগ ৭॥+*০০
রামপুর ৭
সুওরাগর ২ *
অগস্ত্যমুনি ২॥+০
চন্দ্রাপুরী ৪
ভীরী ২॥+
গুপ্তকাশী ৬+০
নালা ১
ফাটা ৭ *
রামপুর ৪॥+
ত্রিযুগীনারায়ণ ৫+
গৌরীকুণ্ড ৬+*

রামওয়াড়া ৪+
কেদারনাথ ২॥+ঃ

এখান হইতে আবার
নালা ২৩
উখীমঠ ২॥+*০ঃ
দোগল ভীটা ১০ *
বানিয়াকুণ্ড ১+
চোপতা ১+
তুঙ্গনাথ ৩+
মণ্ডল ৯+
গোপেশ্বর ৪॥
চামোলী ৩+*০০ঃ
পিপলকুঠী ৯+*০০
গরুড়গঙ্গা ৪+
পাতালগঙ্গা ৪॥
গোলাপকুঠী ১*
কুমার ২+০

যোশীমঠ ৬॥+* ০০ঃ
বিষ্ণুপ্রয়াগ ২
বলদেও ১+
পাণ্ডুকেশ্বর ৫+*
লামবগড় ২॥+
হনুমান চটি ৪+
বদরীনাথ ৫+*০০

প্রত্যাবর্ত্তন ঃ
চামোলী ৪৮
শ্রীনন্দপ্রয়াগ ৭ *০
সোনলা ৩ *
কর্ণপ্রয়াগ ১০+*০০ঃ
আদিবদরী ১১ *০
ধুনার ঘাট ১২ *
মেহলচৌরী ৫ *০
গণাই ৯॥+*০
রাণীক্ষেত ২৬

হরিদ্বার হইতে ঃ

১। যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, ত্রিযুগীনারায়ণ এবং কেদারনাথ হইয়া বদরীনাথ যাইবার সময় ১৫ই এপ্রিল হইতে ৩১শে জুলাই।
২। বদরী-কেদার ১৫ই এপ্রিল হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর।
৩। কেবল বদরীনাথ, এপ্রিলের শেষ হইতে ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত।

হরিদ্বার হইতে গঙ্গোত্রী : ১৯৩ মাইল। যমুনোত্রী হরিদ্বার হইতে ১৬৬ মাইল।
যমুনোত্রী হইতে গঙ্গোত্রী ২৮ মাইল। গঙ্গোত্রী হইতে কেদারনাথ ১২১ মাইল।

সাঙ্কেতিক চিহ্নের অর্থ ঃ— ধর্ম্মশালা +, ইন্সপেকসন বাঙ্গলো •, পোঃ আঃ ০, পোঃ এবং টেলি আঃ ০০, হাসপাতাল ঃ

সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (নিউ থিয়েটার্স)
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৮ঃনং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৭বি, গ্রে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

কেদারনাথ

বদরীনাথ

গুপ্তকাশী

পাণ্ডুকেশ্বর

উখীমঠ

গরুড়গঙ্গা

রুদ্রপ্রয়াগ

দেবপ্রয়াগ

নূতন চিত্র সংবাদ

চিত্রা

এপ্রিল '৫২, ১ম সংখ্যা

'মহাপ্রস্থানের পথে'

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে 'মহাপ্রস্থানের পথে'র বিষয়টি একেবারেই অভিনব। এর আগে হয়ত কোথাও কোথাও পাহাড় পর্বত, নদ নদী অথবা কোনও দুঃসাধ্য বনস্থলীকে পশ্চাদ্‌পটে রেখে নাটকীয় গল্পকে সিনেমা চিত্রে রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু কখনও একটি সর্বজনপ্রিয় ভ্রমণ-কাহিনীকে যে সিনেমা চিত্রে প্রতিফলিত করা যেতে পারে,—এটি বিগতপ্রায় কুড়ি বৎসর যাবৎ চিত্রনির্মাতাগণের চিন্তার অগোচরে ছিল। এই ভ্রমণকাহিনীটি হোলো একজন আধুনিক ঔপন্যাসিকের জীবনের খণ্ডকালের তীর্থযাত্রার ইতিহাস। বিশাল-বিস্তার নগরাজ হিমালয়ের হৃদয়ের মধ্যে অবস্থিত ভগবান বদরিনাথ ও কেদারনাথের দর্শন মানসে কতকাল ধরে' কত তীর্থযাত্রী কত কষ্টে চলেছে,—সেই সকল তীর্থযত্রার কথাও একাধিক ভারতীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে,—কিন্তু পরিব্রাজক প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে'র মধ্যে যে-চিন্তামানস, যে-মননশীলতা এবং তীর্থযাত্রীদলের সাময়িক জীবনের যে সকল গল্প, নাটকীয় ঘটনার ঘাতসংঘাত, তা'দের সুখ দুঃখ বেদনার ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত এই ভ্রমণকাহিনীর ভিতরে আপন আপন পরিপূর্ণতার সঙ্গে বিদ্যমান—এমনটি একালে আর কোথাও লিপিবদ্ধ হয়নি। তীর্থযাত্রা-পথে সকলের একই লক্ষ্য, একই পথ, একই দিনযাত্রা,—কিন্তু তা'র বৈচিত্র্য বহুমুখী। কৌতুকে তা'দের পথ সমুজ্জ্বল, নাটকীয় ঘাত-সংঘাতে তা'রা আলোড়িত, আনন্দ ও বেদনাবোধ তা'রা আন্দোলিত, ঔৎসুক্য আর কৌতূহলে তা'রা ওই উদার মহাস্থবির হিমালয়ের অটল শান্তিকে কলমুখরিত ক'রে তুলেছে। গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে যেমন খরতরা স্রোতস্বিনী উন্মাদিনীর মতো ছুটে চলেছে, তেমনি চলেছে দুর্বার গতিতে তীর্থযাত্রীগণের অজেয় প্রাণধারা। তাদের পথে পথে নেমে আসে বর্ষা, নেমে আসে ঋতুরাজের মনোমোহিনী শোভা। কখনো তা'রা ঠাণ্ডায় কম্পমান,—তুষারের ঝড়ে আর পার্বত্য ঝঞ্ঝায় তা'রা উদ্‌ভ্রান্ত; আবার কখনো বা মহাসূর্যের অগ্নিস্রাবী প্রখরতায় তা'রা ঘর্মাক্ত কলেবর। সেই তীর্থযাত্রীদেরই সঙ্গে চলেছে দুঃখ সুখ, আশা নৈরাশ্য, স্নেহ-মোহ-আনন্দ-আশ্বাসের চিরকালীন মানবিক প্রকৃতি,—'মহাপ্রস্থানের পথে' চিত্রখানিতে তীর্থযাত্রীর এই আন্তরিক ইতিহাসকেই প্রতিফলিত করা হয়েছে। এই ছবিতে জীবন কাহিনী আছে, নাটকীয় সংঘাত আছে, বিস্ময়কর পরিস্থিতির মধ্যে জীবনের বিচিত্র ব্যাখ্যা আছে, রহস্যময় ঘটনার আকস্মিক সমাবেশ আছে,—অথচ এরা সমস্তই চিত্রনির্মাতাগণের অভ্যস্ত চিন্তাধারার বাইরে, চল্‌তিকালের সমস্ত ছবির ছককাটা বুদ্ধি ও ধারণার বাইরে, এবং প্রচলিত আঙ্গিক ও আঙ্কিক কাঠামোর বাইরে। যাঁরা একালের চিত্রশিল্পের নিয়মানুগত সমালোচক এবং সুরসিক,—তাঁরাও এই ছবিকে বিসয়বস্তুর নূতন আবিষ্কার বলে' মনে করবেন।

এই ছবিতে কেবল যে নরনারীর দল শুধু তীর্থপথে চলেছে তাই নয়, এই ছবির ভিতর দিয়ে চলেছে একটি পরিব্রাজকের ধারাবাহিক হৃদয়,—সেই হৃদয়ের অভিব্যক্তি ঘটেছে নানা চরিত্রে, নানা ঘটনায়, নানা মন্দিরে, নানা নদীর ধারায়। সে এক, সে অভিন্ন, সে অবিচ্ছেদ্য। সমগ্র হিমালয়ের মহাশান্তি আর অধ্যাত্ম আনন্দের ভিতরে সেই হৃদয়টি বিরাজমান।

মহাপ্রস্থানের পথে—

—অরুন্ধতী এবং বসন্তকুমার

কেন?

আমাদের দেশে লোমহর্ষক এবং চিত্তচমৎকারী ও মনোবিভ্রান্তকর কল্পিত কাহিনীর কোনো অভাব নেই। এমন বহু বহু গল্প আছে, সিনেমাতে যার সাফল্য নিশ্চিত। চতুর ব্যবসায়ী এই সকল কাহিনীকে ফেলে' বিপথে পা দিতে চান না, ভরসাও করেন না। অর্থই যেখানে কাম্য, সেখানে 'অনর্থের' সৃষ্টি করাকে পাকা সিনেমা ব্যবসায়ী মনে করেন 'অবোধের' কার্য্য। তাই নিশ্চিত সাফল্যের, আর্থিক সাফল্যের কথা বলছি, পথ ছেড়ে তাঁরা সিনেমাতে অন্য কোনো প্রকার সাফল্যের মূল্য দেন না। তাঁদের পাকা হিসেবের খাতায়, অন্য হিসেব বাজে এবং মূল্যহীন। বর্ত্তমান

সিনেমা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্ব্বে একবার বলেন :

"এই সিনেমা আজকালকার দিনে সর্ব-সাধারণের একটা প্রকাণ্ড নেশা। ছেলে বুড়ো সকলকেই প্রতিদিন এতে মাতিয়ে রেখেছে। তার মানে হচ্ছে, সকল বিভাগেই বর্ত্তমান যুগে কলার চেয়ে কারদানি বড়ো হয়ে উঠেছে। প্রয়োজন সাধনের মুগ্ধদৃষ্টি কারদানিকেই পছন্দ করে। সিদ্ধি, ইংরেজিতে যাকে সাক্‌সেস্ বলে, তার প্রধান বাহন হচ্ছে দ্রুত নৈপুণ্য। পাপকমের মধ্য দিয়েও সেই নৈপুণ্যের লীলাদৃশ্য আজ সকলের কাছে উপাদেয়। সুষমাকে কল্যাণকে উপলব্ধি কববার মতো শান্তি ওঅবকাশ প্রতিদিন প্রতিহত হ'তে চলল…"

সাধারণভাবে আমাদের আজকালকার সিনেমা সম্পর্কে একথা স্বীকার করা চলে। কিন্তু ব্যতিক্রম কি নেই? আছে, এবং তা একমাত্র বাঙ্গলা দেশেই দেখা যাবে। যে-চিত্র প্রতিষ্ঠান 'দেশের মাটি', 'জীবন-মরণ', 'প্রতিবাদ, 'ডাক্তার', এবং আরো অনেক এই ধরণের ছবি তৈরী করেছেন, সেই চিত্র প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অবশ্যই একথা বলা চলে যে তাঁরা সিনেমা-শিল্পের মধ্যে দিয়ে সুষমাকে এবং কল্যাণকেই উপলব্ধি করবার অবকাশ লোককে দিতে প্রয়াস করেছেন। ছবির আর্থিক সাফল্যকে তাঁরা কখনো বড়ো করে', সব কিছুর ওপরে দেখেন নি।

এই চিত্র-প্রতিষ্ঠানই আজ সিনেমা-মহলের জানা-রাজপথ ছেড়ে 'মহাপ্রস্থানের পথে'র মতো একটি ছবি তৈরী করতে সাহসী হয়েছেন। ভ্রমণ কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ ছবি আমাদের দেশে এই প্রথম। 'মহাপ্রস্থানের পথে' পুস্তকটি পাঠ করে হাজার হাজার পাঠক তীর্থযাত্রীর সকল আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা নিজেদের মনে অনুভব করেছেন। দেশের বহু চিত্র-নির্ম্মাতাও এই বইটি হয়ত পড়ে গভীর আনন্দ পেয়েছেন, কিন্তু কেউ একে চিত্ররূপ দেবার কল্পনাও করেন নি। তাঁরা হয়ত একে অতি দুঃসাহসী এবং অবোধের কার্য্য হবে বলে' মনে করেছেন। এতো বড়ো পট ভূমিকায় তাঁরা যেতে ভরসা করেন নি। নিউ থিয়েটার্সে'র কর্ণধার হয়ত ঝুনো ব্যবসায়ীর বিচারে 'অবোধ' কিন্তু কলারসিকের বিচারে তাঁর স্থান কি, তার বিচার সুধি কলারসিক ছাড়া অন্য কেউ করতে পারবেন না। কলারসিক একথাই বলবেন—সিনেমার মাধ্যমে সুষমা কল্যাণকে উপলব্ধি করবার মতো অবকাশ এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিউ থিয়েটার্সে'র কর্ণধারের আছে, এবং এটা আছে বলেই তিনি, 'মহাপ্রস্থানের পথে' বইটিকে চিত্রে রূপান্তরিত করবার প্ররোচনা এবং সাহস, তাঁর ভিতরের মানুষটির কাছে পেয়েছেন। অন্যেরা যেখানে বললেন 'পাইনি,' ঠিক সেইখানেই তিনি বললেন 'পেয়েছি'। বাইরের হিসেবে যা মনে হল মূল্যহীন, ভিতরের হিসেবে, তাঁর মনের মানুষ তাকেই ঘোষণা করলে অমূল্য বলে।

তীর্থযাত্রা

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : আমাদের দেশে তীর্থযাত্রা ধর্ম্মসাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। দেবতাকে যখন অভ্যাসের পর্দ্দায় ঘিরে রাখি, তখন আমরা সেই পর্দ্দাকেই পূজা করি। যাদের মন স্বভাবতই বিষয়ী, ধর্ম্মচর্চাতেও যারা বস্তুকে বেশী দাম দেয়, তারা দেবতার চেয়ে পর্দ্দাকেই বেশী শ্রদ্ধা করে।

"তীর্থযাত্রায় সেই পর্দ্দা ঠেলে দিয়ে মন পথে বেরিয়ে পড়ে। তখন প্রতিদিনের সীমাবদ্ধ জানাকে চিরদিনের অসীম অজানার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা সহজ হয়। প্রতিদিন ও চিরদিনের সংগমস্থলেই সত্যের মন্দির।"

'মহাপ্রস্থানের পথে' যাঁরা তীর্থ যাত্রা করেছেন যুগে যুগে, সেই বিস্মৃত প্রায় যুগ থেকে, প্রতিদিনকার জানা পথ এবং চেনা-জগতকে পরিত্যাগ করে তাঁরা অসীমের দিকে, অজানার প্রতি দৃষ্টিপাত করবার অবকাশ লাভ করেছেন। এই অসীম অজানার যাত্রা পথে তীর্থকামীর চোখে পড়ে এমন সকল বস্তু, এমন সকল ব্যক্তি এবং ঘটনা, চিরজানা অভ্যাসের জগতে যারা থেকেও মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। ঘরের পাশের নেহাত সামান্য বস্তুও 'মহাপ্রস্থানের পথে' তীর্থযাত্রীর চোখে হয়ে ওঠে রূপরস পূর্ণ পরম অসামান্য। ঘরের সীমা ছেড়ে, চেনা জগত পরিত্যাগ করে যাঁরা বাইরে যান নি কখনো, তাঁদের কাছে এর অর্থ হয়ত স্পষ্ট হবে না। কিন্তু এটাও সত্যি যে, ঘরে বসেও মানুষ তার অন্তর-দৃষ্টি দিয়ে অজানা পথের রূপরস, তার বিচিত্র আকর্ষণ অনুভব করতে পারে। সামান্য একটি ঘটনা, সামান্য একটি রূপের উপলব্ধি, সামান্য একটি ছবি, নীল আকাশের বুকে সামান্য এক টুকরা মেঘ মানুষের দৃষ্টিকে উদার এবং সুদূর প্রসারী করতে পারে। 'মহাপ্রস্থানের পথে'র ছবি বহুজনকে অজানাকে জানতে, অসীম পথকে চিনতে সাহায্য করবে। ঘরে বসেও দূরের অপরূপ রূপ তার বিচিত্র মোহ নিয়ে দর্শকচিত্তে ঝলমল করে উঠবে। মানুষ যখন জীবনের সকল বিড়ম্বনা, নৈরাশ্য, সকল অবসাদকে তুচ্ছ করে বেরিয়ে পড়ে তীর্থপথের অজানার আকর্ষণে, তখন সেই তীর্থযাত্রী মানুষের ঘুমন্ত মন জেগে ওঠে। তার ভেতরের মানুষ বাইরের মানুষকে বলে—তোমার গভীর বাইরের জগতে কতো ঐশ্বর্য্য, কতো রূপ আর কতো সামান্যের মধ্যে কতো অসামান্য লুকিয়ে আছে, তাকিয়ে দেখো।—তীর্থপথের দুঃখকষ্ট বিপদ বিড়ম্বনা, অভাব অভিযোগ, ভিতরের চিরন্তন মানুষটি বাইরের মানুষটির কাছে সহজ এবং তুচ্ছ করে দেয়। দুরূহ পথ তীর্থযাত্রীর কাছে হয়ে ওঠে পরম লোভনীয়, অতি শোভনীয়। 'মহাপ্রস্থানের পথে'—এই সত্যের উপলব্ধি করা হয়ত তীর্থ অভিলাষী দর্শক মনে সহজ স্বচ্ছ হবে।

মহাপ্রস্থানের পথে—

—বসন্তকুমার, অরুন্ধতী, রাজলক্ষ্মী

অভিনয় যেখানে অভিনয় নয়

সাধারণ ছবিতে—শিল্পী অভিনয় করেন, এটা বেশ বুঝতে পারা যায়। বিশেষ করে যেখানে চিত্রের চরিত্রটি তাঁর মনোমত এবং তাঁর 'স্বাভাবিক চরিত্র' উপযোগী হয় না। এরকম স্থলে—শিল্পীর কাছে কাজ হয়ে ওঠে মূল্যের জন্যে, টাকার বিনিময়।

'মহাপ্রস্থানের পথে' চিত্রে এই প্রায়-

এপ্রিল, ১৯৫২—চিত্রা—প্রথম সংখ্যা

স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা গেছে। এই ছবিতে অভিনয় করবার জন্যে চুক্তি-বদ্ধ হবার সময় শিল্পীবৃন্দ সাধারণ মনোভাব নিয়েই আসেন এবং চলতি নিয়মেই চুক্তিবদ্ধ হন। কিন্তু ছবির কাজ যখন যথারীতি আরম্ভ হল, দেখা গেল এক বিচিত্র ব্যাপার। 'মহাপ্রস্থানের পথে' অভিনয়কারী দলের সকল শিল্পীই ক্রমে সত্যিকার তীর্থযাত্রীতে পরিণত হলেন। এটা যেন কোনো এক অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিত এবং পরিচালনায় সম্ভব হলো। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর অন্তর দেবতা শ্রীকেদারনাথ এবং শ্রীবদরীনাথের নামের মাহাত্ম্য কি না তাই বা কে বলতে পারে? ছবি তোলবার সময় স্ত্রী-পুরুষ সকল শিল্পীকে দেখে মনে হয়েছে—প্রত্যেকেই যেন বলতে চান 'আমি কাজ করছি না, সেবা করছি।' শিল্পীদের মনে এই 'সেবার' ভাব জাগ্রত হয়েছিল বলেই—'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবি হয়েছে হৃদয়ের রচনা, শক্তির অর্থাৎ কোনো হুকুমের চালনার সৃষ্টি নয়। এমন ভাবে সকলে কাজ করেছেন যাতে মনে হয়, তাঁরা যেন 'নিজেদের নানা সাজে-সজ্জায়, ভাবে ভঙ্গীতে, চালে চলনে, নানা ব্যঞ্জনা দিয়ে বস্তুলোকের প্রত্যন্তদেশে রসলোকের অধিবাসী করে দাঁড় করিয়েছেন'। একথা বিশেষ করে বলতে হয় প্রবোধকুমারের ভূমিকায় বসন্তকুমার এবং রাণীর ভূমিকায় অরুন্ধতী সম্পর্কে। এঁরা দুজনেই নবাগত, কিন্তু তা সত্বেও অকৃপণ ভাবে নিজেদের গ্রন্থগত চরিত্র দুটির মধ্যে নিমজ্জিত করেছেন। এঁরা অভিনয় রসের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন অনার্সে'র নম্বর পেয়ে। অভিনেতা-জীবনে অভিনয় যে ক্ষেত্র-বিশেষে কেবল অভিনয় নয়, এঁরা তা প্রমাণ করেছেন।

সাধারণ দর্শকের কাছেও এটা ধরা পড়বে। এই ছবির এমন একটি পরম রূপ তাঁরা দেখতে পাবেন, যা, কেবল মাত্র বিজ্ঞাপনের ভাষায় 'অনন্যসাধারণ' নয়, বাস্তবেও বটে। ভ্রমণ কাহিনী হিসেবে 'মহাপ্রস্থানের পথে' যেমন অপূর্ব্ব বস্তু, লেখক যেমন অবলীলাক্রমে পাঠককে তাঁর সঙ্গে টেনে নিয়ে গেছেন দিগ-দিগন্তে, ছবিও ঠিক তাই করবে। হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার জিনিষকে ভাষা দিয়ে বোঝাবার বেশী চেষ্টা বৃথা করে লাভ নেই।

আর কদিন পরেই ছবিখানি সকলে দেখতে পাবেন। নিজেরাই তখন এর বিচার করতে পারবেন।

হিমালয় অভিযান

বিদেশী যে-সকল মহাজন বহুকাল ধরে হিমালয় অভিযান করেছেন, তাঁরা একটি বিষয়ে একমত : "Himalayan mountaineering depends upon unselfish team work, and unselfish team work depends upon having a team of men who are temperamentally in phase."

মুক্তি আগতপ্রায়

ভ্রমণ কাহিনী : প্রবোধ সান্যাল
পরিচালনা : কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত : পঙ্কজ মল্লিক
চিত্রশিল্পী : অমূল্য মুখোপাধ্যায়
শব্দযন্ত্রী : শ্যামসুন্দর ঘোষ
শিল্প-নির্দেশক : সুধেন্দু রায়

●

ভূমিককায় : বসন্ত চৌধুরী, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, অভি ভট্টাচার্য্য, শিশির, নীতিশ, গৌরীশঙ্কর, মলিনা, মায়া বোস, রাজলক্ষ্মী (বড়), বন্দনা, মনোরমা, আশালতা প্রভৃতি।

●

মহাপ্রস্থানের পথে

"…তোমার সৃষ্টি, তোমার মন, তোমার ভাষা সমস্তই পথ-চলিয়ে, পাঠকের মনকে রাস্তায় বের করে আনে। তোমার লেখা চলেছে শাস্ত্রিক পথ দিয়ে নয়, ভৌগোলিক পথ দিয়ে নয়, মানুষের পথ দিয়ে। কত শতাব্দী ধরে দুঃসাধ্য সাধনরত মানুষের দুর্গম যাত্রার প্রয়াস নিরবচ্ছিন্ন বয়ে চলেছে—এই তীর্থ যাত্রা তারই প্রতীক।……কৌতুক ও কৌতুহল পাঠককে স্থির থাকতে দেয় না।"—রবীন্দ্রনাথ ॥

'মহাপ্রস্থানের পথে'
চিত্রখানিও অপরূপ রূপরসে কৌতুকে
কৌতুহলে ঘটনাপ্রবাহে পরম গতিশীল।

চিত্রা, প্রাচী, ইন্দিরা
এবং অন্যান্য সিনেমায় মুক্তিলাভ করবে।

পরিবেশক : অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিমিটেড্।

মহাপ্রস্থানের পথে—

—শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

একথা যে কত সত্য, তা, 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবি তুলতে নিউ থিয়েটার্সের যে দলটি হিমালয় অভিযান করেন, বুঝতে পারেন। একই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ না হলে এই দল বোধ হয় এমন সুসংঘবদ্ধ ভাবে কখনো কাজ করতে পারতেন না। হিমালয়ের দুরূহ পথে, প্রান্তরে গিরি-গুহায় যে বিষম কষ্ট মানুষকে সহ্য করতে হয়, অনাহারে অর্দ্ধাহারে এবং অনিদ্রায়, তাতে তার পক্ষে মানসিক সমতা রাখা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে ওঠে। এই সময় মানুষের মেজাজ এমন খিটখিটে এবং ঝাঁঝালো হয় যে—সামান্য কারণে, এমন কি অকারণেও—পরম বন্ধুও হয়ে পড়ে তার শত্রু! পরস্পরের যে সকল ত্রুটি বিচ্যুতি মানুষ শহরের জানা-মহলে গ্রাহ্য করে না, হিমালয়ের বিপদসঙ্কুল পথে সেই সকল সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি হয়ে পড়ে পাহাড়-প্রমাণ! মনের এ-পরিবর্ত্তন কেন ঘটে, তার কারণ বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, বলতে পারবেন মনোবিদ। বিদেশী পরিব্রাজক অনেকের মতে হিমালয় অভিযান কালে: "Your friend in civilisation may become your enemy on a mountain; his very snore assumes a new and repellent note; his tricks at the mess table, the sound of his mastication..... even the cut of his clothes and the colour of the patch on the seat of his trousers, may induce an irritation and loathing almost beyond endurance."

আশ্চর্য্যের কথা, হাজার রকমের কষ্ট বিপদের মধ্যেও আমাদের এই হিমালয় অভিযানকারী দলে উপরি উক্ত বিপদ কখনো প্রকট হয় নি, কাজ কর্ম্মেও বিশেষ কোনো বাধার সৃষ্টি করে নি। পথের কষ্টকে যাঁরা সহজ ভাবে নিতে পারেন, মনের ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা যাঁরা হারান না, হিমালয়ের পথ চলা তাঁদের পক্ষে হয় সহজ। দলপতি থাকলে, তিনি যদি পদ-মর্য্যাদা এবং ছোট-বড় প্রশ্ন নিয়ে মাথা না ঘামান, তাহলে দলের মধ্যে একটা বিচিত্র সাম্যভাব থাকে। এ-বিষয় কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়কে প্রশংসা করবো। দলপতি হলেও, তিনি কখনো অযথা মাতব্বরী করতে যান নি। সবার সঙ্গে সমানে কাজ করেছেন। দিনের কাজ শেষ করে আড্ডাতে ফিরে তিনি কথায়-বার্তায়, হাসি ঠাট্টায়, গল্প-গুজবে, নিরানন্দ অবসরকে করে তুলতেন পরম সরস এবং আনন্দময়। তাঁর দলের সকলেই তাঁকে দিয়েছেন অকুণ্ঠ সহযোগিতা—যার ফলে কাজ তাঁদের কাছে হয়ে উঠেছিল একদিকে প্রায় খেলার সামিল, অন্যদিকে পুণ্যব্রত পালন।

মহাপ্রস্থানের পথে—

—শ্রীবদরীনাথ মন্দির প্রাঙ্গনে একটি দৃশ্য

১৭২ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
৩।১, মোহন বাগান লেন, 'দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া' হইতে মুদ্রিত।